মুখোশ

আভা দেবী

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটাৰ্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য আড়াই টাকা

আধুনিক কথাসাহিত্য সৃষ্টির প্রারম্ভে আমরা প্রথম যাঁদেরকে দেখেছি তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন অগ্রগণ্য। গঙ্গা যেমন বহুজনপদকে সঞ্জীবিত ক'রে চ'লে যায় সাগরের দিকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য পরবর্তীকালের বহু লেখককে অনুপ্রাণিত ক'রে চ'লে গিয়েছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে প্রাচীন সরোবরের মতো। তাঁর পরবর্তী যুগে অনেক মহিলা-লেখক এসেছেন অনেক প্রকার সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে, তাঁদের মধ্যে সত্যকার খ্যাতিলাভ করেছেনও কয়েক জন। কিন্তু কথাসাহিত্যে হাত যাঁদের পেকে উঠেছিল, তাঁরা ভারতীয় আদর্শ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক কঠোরতাকেই প্রচার ক'রে এসেছেন। মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় করেছেন আচার ও সংস্কারকে; বুদ্ধি ও যুক্তির চেয়ে বড় ক'রে তুলেছেন শাসন ব্যবস্থাকে। এ যুগের মেয়েরা এই কঠোরতাকে বরদাস্ত করেনি, সেইজন্য তারা খুঁজে ফিরেছে নিজেদের মুখপাত্রী। বর্তমান কথা-সাহিত্যে যে কয়েকজন শক্তিশালিনীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা সাহিত্যের সর্বপ্রধান যেটি আদর্শ—সেই রসসৃষ্টি অপেক্ষা সামাজিক অব্যবস্থার বিপক্ষে আঘাত করতে চাইছেন। এটার অবশ্যই দরকার ছিল। মেয়েদের নিজস্ব চোখ দিয়ে মেয়েরা মেয়েদের মনকে উদ্ঘাটিত করবে, এবং সেই সংস্থার মধ্যে বিচার করবে পুরুষকে,—এটি অন্তত আমি চেয়ে এসেছি বরাবর। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শ্রীমতী আভা গুপ্তার 'মুখোশ' বইটি প'ড়ে আমার মনে হচ্ছে, আধুনিক কথা সাহিত্যে প্রতিভাবতী দুঃসাহসিকার আবির্ভাব ঘটতে আর বিলম্ব নেই। দুঃসাহস এই জন্য বলছি যে, প্রাচীন সামাজিক

আদর্শের গুণ গান ক'রে যে সব মেয়ে-লেখক সমাজপতি-জগৎকে তুষ্ট করতে চান্, আভা গুপ্তা তাঁদের কেউ নন্। 'মুখোশ' বইটিতে তাঁর নিজস্ব যে আশ্চর্য মনটি বার বার নিজেকে প্রকাশ করেছে,—সেটি জননী, ভগিনী, জায়া, কন্যা অথবা সুন্দরী বধূর মন নয়,—সেটি একজন প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও সর্বসংস্কারমুক্তা নারী লেখকের। তাঁর দৃষ্টি শুধু অনেকখানি স্বচ্ছই নয়, তীব্র,—এবং তাঁর বাচন পদ্ধতি শাণিত ছুরির ফলকের মতো ঝলসে উঠতে চায়। এ বইতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা রূপসীর অসহায় কান্না নেই, যদি কোথাও থাকে তবে সেটি মুক্তার মতো কঠিন অশ্রু বিন্দু। তাঁর কথায়, বর্ণনায়, রচনায় এমন দীপ্তির চমক আছে, যা বিদ্যুৎবহ্নির মতো পাঠকেব চক্ষুকে বিভ্রান্ত করবে, এবং মেয়েদেব মনের ঝুঁটি নাড়া দিতে পারবে। বইখানি প'ড়ে আমি সত্যকার পরিতৃপ্তি লাভ করেছি এইজন্য যে, কথা সাহিত্যের প্রকৃত রসমাধুর্য ছাড়াও এতে প্রকাশ পেয়েছে আত্মসম্ভ্রম বক্ষাব কাজে মেয়েদের কঠিন প্রতিশ্রুতি, এবং কঠিনতর চিত্তের দৃঢ়তা,—নারী-সাহিত্যে যেটি দুর্লভ। বাঙ্গলাব অনেক লেখিকাব মধ্যে প্রতিভার বীজ দেখেছি, কিন্তু সেই বীজ অঙ্কুরিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সংস্কার বুদ্ধি তাঁদেরকে পেয়ে বসে,—তাঁবা সাহিত্যেও জননী এবং ভগিনী হ'য়ে বসতে চান। কিন্তু 'মুখোশ' বইটি পডলেই বুঝতে পারা যাবে, এর লেখিকা নারী ছাড়া আর কিছু নন্। তিনি সমাজের, আচারের, সংস্কারের, লৌকিকতার অথবা ঘরকন্নার—কোথাও দাসীত্ব করেননি। এমন লেখিকা নতুন সন্দেহ নেই, এবং এমনই নতুন যে এঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতেও ভয় করে। আমার ধারণা এই অগ্নিহোত্রী লেখিকার উপরে সমালোচক সম্প্রদায় ক্রমশ আক্রমণ করবেন, কিন্তু এই শক্তিশালিনী লেখিকা আপন তেজস্বিতার গুণে নিজের জন্য একটি নতুন পথ রচনা কববেন। এই বইটি সযত্নে পাঠ ক'রে আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মুখোশ

যুগল বিহঙ্গম ছুটে চলেছে দূরে বহুদূরে অনন্ত নীলিমার বুকে-ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধনভে।

একদিন নীড় বাঁধার আশায় নীচে নেমে আসতেই অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ সায়ক এসে বিঁধে বিহঙ্গীর বুকে। করুণ শব্দ করে ঘুরে ঘুরে পড়তে থাকে বিহঙ্গিনী; শেষে কালো মাটির বুকে পড়ে এক টানা কান্নার সুরে সে তার শেষ বিদায় জানায়। বিহঙ্গম তার প্রিয়ার দেহ বার বার প্রদক্ষিণ করে আবার চলতে শুরু করে। সেই গ্রাম, সেই দেশ, সেই মহাদেশকে নিরাক্ষণ করে—যেখানে তার প্রিয়ার শোণিত-সিক্ত মাটি কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে ধুলো হয়ে মিশেছিল বাতাসের সাথে। তার প্রসারিত দৃষ্টির তীব্রতায় পৃথিবীর কালো মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

গ্রামের নাম কুসুমপুর। ডাক্তার হরিনারায়ণের খিড়কি দরজায় পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ে তেঁতুলের বিচি দিয়ে বারোগুটি-বাঘচাল খেলছে নিবিষ্ট মনে। ওপাশে পুকুরের বাঁধানো চত্বরে আরো কটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে ছোট্ট তাসের ফেট্টি দিয়ে "ব্রে" খেলছে! ঝুমুর—ডাক্তার হরিনারায়ণের কন্যা—ওর নিজের হাতটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, উঃ কি তাসটাই পেয়েছি।

খেলার শেষে দেখা যায় ঝুমুরই 'ব্রে'। মাধবী, ঝুমুরের পরম বন্ধু, সোৎসাহে বলে ওঠে, ঝুমুর তুই বড্ড বোকা, খেনোর হাতটা একবার চুরি করে দেখে নিয়ে, ব্রেটা ওকে পাশালেই পারতিস!

আদর্শের গুণ গান ক'রে যে সব মেয়ে-লেখক সমাজপতি-জগৎকে তুষ্ট করতে চান, আভা গুপ্তা তাঁদের কেউ নন্। 'মুখোশ' বইটিতে তাঁর নিজস্ব যে আশ্চর্য মনটি বার বার নিজেকে প্রকাশ করেছে,—সেটি জননী, ভগিনী, জায়া, কন্যা অথবা সুন্দরী বধূর মন নয়,—সেটি একজন প্রখর বুদ্ধিশালিনী ও সর্বসংস্কারমুক্তা নারী লেখকের। তাঁর দৃষ্টি শুধু অনেকখানি স্বচ্ছই নয়, তীব্র,—এবং তাঁর বাচন পদ্ধতি শাণিত ছুরির ফলকের মতো ঝলসে উঠতে চায়। এ বইতে ভাগ্যবিড়ম্বিতা রূপসীর অসহায় কান্না নেই, যদি কোথাও থাকে তবে সেটি মুক্তার মতো কঠিন অশ্রু বিন্দু। তাঁর কথায়, বর্ণনায়, বচনায় এমন দীপ্তির চমক আছে, যা বিদ্যুৎবহ্নির মতো পাঠকের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করবে, এবং মেয়েদের মনের ঝুঁটি নাড়া দিতে পারবে। বইখানি প'ড়ে আমি সত্যকার পরিতৃপ্তি লাভ করেছি এইজন্য যে, কথা সাহিত্যের প্রকৃত রসমাধুর্য ছাড়াও এতে প্রকাশ পেয়েছে আত্মসম্ভ্রম বক্ষার কাজে মেয়েদের কঠিন প্রতিশ্রুতি, এবং কঠিনতব চিত্তের দৃঢ়তা,—নারী-সাহিত্যে যেটি দুর্লভ। বাঙ্গলার অনেক লেখিকাব মধ্যে প্রতিভার বীজ দেখেছি, কিন্তু সেই বীজ অঙ্কুরিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সংস্কার বুদ্ধি তাঁদেরকে পেয়ে বসে,—তাঁরা সাহিত্যেও জননী এবং ভগিনী হ'য়ে বসতে চান। কিন্তু 'মুখোশ' বইটি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে, এর লেখিকা নারী ছাড়া আর কিছু নন্। তিনি সমাজের, আচারের, সংস্কারের, লৌকিকতার অথবা ঘরকন্নার—কোথাও দাসীত্ব করেননি। এমন লেখিকা নতুন সন্দেহ নেই, এবং এমনই নতুন যে এঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতেও ভয় করে। আমার ধারণা এই অগ্নিহোত্রী লেখিকার উপরে সমালোচক সম্প্রদায় ক্রমশ আক্রমণ করবেন, কিন্তু এই শক্তিশালিনী লেখিকা আপন তেজস্বিতার গুণে নিজের জন্য একটি নতুন পথ রচনা করবেন। এই বইটি সযত্নে পাঠ ক'রে আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মুখোশ

যুগল বিহঙ্গম ছুটে চলেছে দূরে বহুদূরে অনন্ত নীলিমার বুকে- উর্দ্ধে আরো উর্দ্ধনভে।

একদিন নীড় বাঁধার আশায় নীচে নেমে আসতেই অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ সায়ক এসে বিঁধে বিহঙ্গীব বুকে। করুণ শব্দ করে ঘুরে ঘুরে পড়তে থাকে বিহঙ্গিনী; শেষে কালো মাটির বুকে পড়ে এক টানা কান্নাব সুরে সে তার শেষ বিদায় জানায়। বিহঙ্গম তার প্রিয়ার দেহ বার বার প্রদক্ষিণ করে আবার চলতে সুরু করে। সেই গ্রাম, সেই দেশ, সেই মহাদেশকে নিরাক্ষণ করে—যেখানে তার প্রিয়ার শোণিত-সিক্ত মাটি কিছুক্ষণেব মধ্যে শুকিয়ে ধূলো হয়ে মিশেছিল বাতাসের সাথে। তার প্রসারিত দৃষ্টির তীব্রতায় পৃথিবীর কালো মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

গ্রামের নাম কুসুমপুর। ডাক্তার হরিনারায়ণের খিড়কি দরজায় পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ে তেঁতুলের বিচি দিয়ে বারোগুটি- বাঘচাল খেলছে নিবিষ্ট মনে। ওপাশে পুকুরের বাঁধানো চত্বরে আরো কটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ে ছোট্ট তাসের ফেট্টি দিয়ে "ব্রে" খেলছে। ঝুমুর—ডাক্তার হরিনারায়ণের কন্যা—ওর নিজের হাতটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, উঃ কি তাসটাই পেয়েছি।

খেলার শেষে দেখা যায় ঝুমুরই 'ব্রে'। মাধবী, ঝুমুরের পরম বন্ধু, সোৎসাহে বলে ওঠে, ঝুমুর তুই বড্ড বোকা, ধেনোর হাতটা একবার চুরি করে দেখে নিয়ে, ব্রেটা ওকে পাশালেই পারতিস!

—হাতে যে অনেকগুলো ইস্কাপন এসেছিল ; তা ছাড়া চুরি করে জেতা আর মিথ্যে কথা বলে নামকুড়োনো এ হু'টোর একটাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ধেনো ওদেরই সমবয়সী বন্ধু, বান্ধবী নয়। ওদের কথা শুনে বলে, এই জন্মই তো ঝুমুরকে আমার এত ভালো লাগে।

—হ্যাঁ ভাই, আমারও তোকে খুব ভাল লাগে। ঝুমুর প্রতিধ্বনির মত ব'লে ওঠে।

মাধবী চোখ বড় বড় করে বলে, ঝুমুর, ঠাকুমা বলেছেন ও কথা বলতে নেই, পুরুষ মানুষকে ভাল লাগে—একথা বলা নাকি মহা পাপ!

—হুঁ, তাই নাকি! আমি বলেছি আর তুই শুনেছিস! যা ওঠ, কানে আঙ্গুল দিয়ে পুকুরের জলে একটা ডুব দিয়ে আয়!

কথা শুনে সব সাথী হো, হো, করে হেসে ওঠে।

মাধবী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বলে, এই জন্মেই তো ঠাকুমা বলেন, ঝুমুরের সাথে মিশিস নে, ঠাকুমা আরো কি বলেন জানিস? ঝুমুরের মত মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারবে না—ও বড্ড পুরুষঘেঁষা!

ঝুমুর ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, যা যা, তোর ঠাকুমা যেন সবজান্তা! তোর ঠাকুমার মত স্বামীর ঘর আমি করবো না; মদখেকো মূর্খ দোজবর স্বামী আমার হবে না।

সমবয়সী আরো হু' একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—লতা, কিশোরী, আসবি আমার সাথে?

কিশোরী মেয়েটি শান্ত—এদের মত পাড়াময় দস্যিপনা করে বেড়ায় না—কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, মাধবী যদি বাড়ীতে বলে দেয়!

—তবে থাক্ তোকে আসতে হবে না।

মাধবীর সাথে সখিত্ব সেই সন্ধ্যাতেই শেষ হয়।

এতটুকু মেয়ের মা, বাপ, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা তুলে কথা বলার জের

ঝুমুরের জেঠাইমাকেই টানতে হয়। দু’ একজন বর্ষিয়সী মহিলা ওর জেঠাইমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, মা-মরা বলে কি শিক্ষা দিতে নেই—মেয়ে তো নয়—সিংহী অবতার!

ঝুমুরের খেলার সাথীর সংখ্যা একটি একটি করে কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ধেনোর হাত ধরে ও ভিন্ন পাড়ায় খেলতে যায়। পাড়ার মেয়েরা নাকি ওকে বয়কট করেছে; ধেনোর সাথে ভাবটা ওর আরো বেশী জমে উঠেছে। ঝুমুর আদর করে ওকে ডাকে ধেনো-লঙ্কা, আর ধেনো ওকে ডাকে মৌমাছি।

শ্রাবণের ভরা সন্ধ্যায় ধেনো আর ঝুমুর বাড়ী ফেরবার পথে বৃষ্টিতে বিপন্ন হ’য়ে, একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ধেনো ঝুমুরকে বলে ঝুমুর, এই নে আমার গেঞ্জিটা, এটা দিয়ে তোর মাথাটা খুব ভাল করে জড়িয়ে নে, নইলে যা জোরে বৃষ্টি নামলো, মাথায় কিছু না দিলে তোর চুলগুলো সব ভিজে যাবে।

ঝুমুর বিজ্ঞের মত বলে, দূর বোকা! তোর ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি আমায় ভেজার হাত থেকে বাঁচাবে? ভিজতে তো হবেই; কিন্তু ভাবছি সন্ধ্যে হয়ে এলো?

—ভয় পেয়েছিস বুঝি? নে ধর আমার হাত! ধেনোর বুকে তখন ছোট্ট পুরুষ চিত্ত জেগে ওঠে। ও ঝুমুরের অন্ধকার ভয়ের ত্রাতা হতে চায়।

ঝুমুর হাত বাড়িয়ে বলে, নে ধর দেখি আমার হাত;—কেমন তোর ক্ষমতা। ডাণ্ডাগুলী খেলে খেলে মনুয়ার মত আমার হাত হয়েছে (মনুয়া ওদের বাড়ীর নেপালী চাকর)।

তোর ঐ পাঁকাটি হাত আমার হাতের পাঞ্জা ধরবে, তুইও পাগল।

আহত হয়ে ধেনো ওর হাত ধরতে গিয়ে, কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করে। ঝুমুর হাত সরিয়ে নিয়ে বলে, তোর সে ক্ষমতা নেই, বরঞ্চ আয় আমি তোর হাত ধরি। ঝুমুর বজ্রমুষ্টিতে ওর হাত ধরে।

ও পাড়ার ছেলেগুলো তখন দল বেঁধে বড় বড় কচুর পাতা মাথায় দিয়ে চিৎকার করে ছড়া কেটে বলছে ঃ

ম্যাঘা রাণী, ম্যাঘা রাণী
হাত পা ধুয়ে ফেল পানী
ফুল বনে হাটু খানি
কানা দেওয়ের ভাই।
আরো ফুটি জল দাও
ঝাপুরী খেলাই।

অবিরত বৃষ্টিতে ব্যাংগুলো সমস্বরে সুর ধরেছে ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং। জল জমা ডোবা নালায় ডোঙ্গা ভাসিয়ে হাটুরেরা শূন্য হাতে ফিরতি পথে বাড়ী যাচ্ছে। দুষ্টু ছেলের দল কাগজের নৌকা ভাসিয়ে যেন সমুদ্রগামী জাহাজের গতি নিরীক্ষণ করছে। জলের ভেতর টুপ টাপ ঢিল ছুড়ে ছল্‌কে ওঠা জলগুলোর ভেতব কব্জির জোরের পরীক্ষা চলছে। ওপাড়ার বিন্দী পিসী তাঁব ঘরে-না-ফেরা গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝুমুরকে আর ধেনোকে একা একা ভর সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর অভিজ্ঞ পিচুটিপড়া চোখ দুটো যেন মাটির নীচ থেকে একটা বিরাট খনি আবিষ্কার করে ফেলে! কাছে এসে বলে, কিরে ধেনো,—এই অন্ধকারে তুই এখানে কেন ঐ ধেড়ে মেয়েটার সাথে?

'ধেড়ে কথাটা ঝুমুর ধাতস্ত করতে না পেরে চীৎকার করে গলার রগ ফুলিয়ে বলে—বেশ আমি ধেড়ে আছি, তোর কি! তোর মত তো আর ধ্যাড়ধেড়ে নই. কচ্ছপের মত কাদার ভেতর চলেছে কেমন থবথবিয়ে দেখ না!

বিন্দীর জীবন-কাহিনী খুব শুভ্র নয়। বয়েসকালে অনেক

জোয়ানের সাথেই তাকে আমতলায়-জামতলায় ফিরতে দেখা গিয়েছে। ওর বোবা স্বামী মুখে কিছু বলতে না পেরে মাঝে মাঝে মারপিট করেছে। এ কথা এ গ্রামের অনেকেই জানে। কিন্তু এখন বৃদ্ধা বিন্দীকে অনেকেই সমীহ করে কথা বলে। পাড়ার মাতব্বরেরা বলেন, যাই হোক বুড়ো মানুষ ওকে মেনে চলাই ভাল। গ্রামে ওর সুনাম আছে ; বিনা ডাক্তারে বিন্দী ভাল প্রসব করাতে পারে ; আপদে-বিপদে ওকে কাজে লাগে।

ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত বড়ই অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায় দু'কথায় ঝুমুর শেষ পর্য্যন্ত ওর মুখে খানিকটা কাদা ছুঁড়ে মারে। সেই কাদামাখা অবস্থাতেই বিন্দী গরুখোঁজা বন্ধ করে একেবারে ধেনোদের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক রঙ চড়িয়ে অন্ধকারে বকুল তলায় ঝুমুর আর ধেনোর দাঁড়িয়ে থাকার কাহিনীকে ব্যাখ্যা করে।

ডাক্তার হরিনারায়ণের কানে কিন্তু একথা তুলতে কেউ সাহস পায় না। গ্রামের অনেকেই জানে মাতৃহীন ঝুমুরের জন্যই ডাক্তার বাবু এখনো এ গ্রামে আছেন। ঝুমুর না থাকলে উনি বৃন্দাবনে চলে যেতেন। গ্রামের মধ্যে পাশ-করা ভাল ডাক্তার ঐ একটিই।

বৃষ্টির গতি একটু মন্থর হবার সাথে সাথে ওরা বাড়ী ফিরে আসে। ধেনো সে দিন খায় বেদম প্রহার। নাকে খত খাইয়ে ধেনোর বাবা ধেনোকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করান—তিন সত্যি কর, ঝুমুরের সাথে আর খেলবিনে! ধেনো চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওরে বাবা, আর মেরো না, ঝুমুরের সাথে আমি আর খেলবো না, খেলবো না, খেলবো না!

আর ঝুমুর বাবার পাশে শুয়ে শুয়ে টিনের চালের উপর ঝর-ঝরিয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দের সাথে সাথে শুনতে থাকে মানুষের মহানুভবতার বিচিত্র কাহিনী—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, অভিমন্যু বধ, খাণ্ডব বন দাহন ইত্যাদি।

ধেনোর বিচক্ষণ পিতৃদেব ধেনোর সেদিনের রাত্রের অন্নজল বন্ধ করার আদেশ দিয়ে পুত্রের কিশোর জীবনের চঞ্চলতার বন্যা টেনে ধরলেন ভবিষ্যতে সুপুত্রের জনক হবার আশায়।

সেদিনের সেই অপূর্ব্ব শাসনের ফলে ধেনো আর খেলার মাঠে যায় না। ঝুমুর কিন্তু যথারীতি যায়। বাড়ীতেও ফেরে সময় মত। সেদিন খেলা শেষ করে বাড়ীতে ঢোকবার পথে চোরের মত ধেনোকে লুলিয়ে থাকতে দেখে ঝুমুর চীৎকার করে ডাকে, কি রে ধেনো, খেলার মাঠে যাস না কেন, জানিস আজকে দু' বাজি জিতেছি!

ধেনো মুখে আঙ্গুল দিয়ে বলে, চুপ, আস্তে!

ঝুমুর আরো চীৎকার করে বলে চুপ কেন রে, বুড়ি-ছোঁয়া খেলছিস নাকি?

ধেনো ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে বলে, না রে, বাবা তোর সাথে খেলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সেদিন কি মারটাই না খেয়েছি! বাবা বাড়ীতে নেই, লুকিয়ে লুকিয়ে তাইতো তোর সাথে দেখা করতে এলাম।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা কেন করতে এলি, আমি জেলখানার কয়েদী নাকি? বাড়ী যা, মাঠে ঝুমুরের সাথে খেলতে যার সাহস নেই, ঝুমুর জীবনেও তার মুখ দেখে না। আজ যদি তুই মাঠে থাকতিস আমি চার বাজি জিততাম।

ধেনো অনুনয় করে ডাকে, মৌমাছি!

—যা বাড়ী যা, ঝুমুর খারাপ মেয়ে, তার সাথে মিশতে নেই!

—আমি কি তোকে খারাপ বলেছি, ধেনো প্রশ্ন করে।

না, তুই বলিসনি; কিন্তু 'ঝুমুর খারাপ মেয়ে'—এ কথাটাকে মেনে নিয়েছিস। আবার কেন মিছিমিছি মার খেয়ে মরবি, সন্ধ্যে হলো, বাড়ী যা! ঝুমুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে বাড়ী ঢোকে।

দুই বৎসর পরের কথা। ঝুমুর এখন চতুর্দশী। খেলার মাঠে সে যায় না। বাড়ীতে গান বাজনা, লেখাপড়া, গৃহস্থালীর কাজ শেখে এবং প্রকাশ্যেই বড় বড় লেখকের লেখা বাংলা নভেলও সে পড়ে। মনটা তার বয়সের গুণে একটুআধটু শান্ত হয়েছে; কিন্তু হাত-পা তার এখনো অশান্ত। মাঝে মাঝে আশে পাশের গ্রাম থেকে ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসে, কিন্তু হরিনারায়ণ সে প্রস্তাবে বিশেষ কান পাতেন না।

ঝুমুরের পাশের বাড়ীতে থাকেন দারোগা অনুকূল সান্যাল। সম্প্রতি তিনি অবসরপ্রাপ্ত। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়; তার উপর অল্পসল্প পানদোষও আছে। আশ্বিনের এক সন্ধ্যায় সম্প্রতি বিলাত-প্রত্যাগত ভাইপোটিকে নিয়ে তিনি ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারীতে সদলবলে হানা দেন। ঝুমুরকে এই পরমলব্ধ ভাইপোটির হাতে পাত্রস্থ করাই তার একান্ত আবেদন। অনুকূল সান্যালের ভাইপোটির পরিধানে আদ্দির পাঞ্জাবী; মিলের ধুতি, চোখে চশমা। পরিচয় শেষ হবার সাথে সাথে তিনি অত্যন্ত আধুনিক কায়দায় হাত দুটো বুকে ঠেকিয়ে ডাক্তার হরিনারায়ণকে অভিবাদন জানান।

হরিনারায়ণ প্রতি-অভিবাদন জানিয়ে স্মিত হাস্যে বলেন, অনুকূলবাবুর মুখে আপনার অনেক প্রশংসাই শুনেছি; তা ছাড়া আপনি বহু দেশ ঘুরে এসেছেন; সে দেশের জল বাতাস এবং সামাজিক জীবনকে আপনি কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, বিভূতিবাবু?

বিভূতি তার কড়া পাইপে সাময়িক শেষ টান দিয়ে বলে, সে দেশের জীবন জলতরঙ্গের মত প্রবাহমান। সরম নেই, শঙ্কা নেই, চিত্তের অবাধ গতি সহজ ভাবেই জীবনকে গড়ে তুলতে পারে; সমাজ জীবনে স্বাস্থ্য আর সম্পদ আপনা থেকেই ধরা দেয়। তা ছাড়া নর ও নারীর মধ্যে বিরাট প্রাচীর তুলে অন্তরের সংকীর্ণতাকে আমাদের দেশের মত বাড়িয়ে তোলে না।

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ডাক্তার হরিনারায়ণ বলেন আমাদের দেশের

জল বাতাসে, মাতৃক্রোড়ে, বন্ধুপ্রীতিতে, স্ত্রী-পুরুষের স্বার্থহীন আত্মদানে যে আন্তরিকতা আছে সেটা ওদেশে আছে কি ?

বিভূতি পাইপে দুই একটা টান দিয়ে বলে, সে দেশের অবাধ মেলামেশা সব চাইতে বড় কথা, সেখানে তো মিথ্যে ফাঁকি নেই !

—এই মেকি কথাটা মানুষের মনের মোহ ছাড়া আব কিছুই না, পাঁকে ঢুকবো কিন্তু গায়ে পাঁক লাগবে না সেটা পাঁকাল মাছেরই সম্ভব মানুষের নয়। মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপায়ী শিশুরও যৌন অনুভূতি আছে, আর আপনি বলছেন সেখানে মিথ্যে ফাঁকি নেই। অবাধ মেলামেশা কথাটার ওপর আমি মিথ্যে আস্থা রাখিনে, তবে 'য়্যাক্‌সেপট্‌নেস্' বলে যে কথাটা আছে, এই কথাটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কেন না মানুষের জীবনের পথে সানন্দ অনুমতি খুব বড় জিনিস। চোরের চুরি করবাব পেছনে চোরেব প্রিয়জনের অনুমতি থাকলে সে চোর পরবর্তীকালে পাকা চোর হলেও হতে পাবে।

বিভূতি ঠিক এ জাতীয় কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কথার খেই ধরতে না পেবে বলে তবে কি আপনি বলতে চান, ওদেশের সব কিছুই বিকারগ্রস্ত ?

—না একেবারেই না, বরঞ্চ ও দেশটা একেবারেই মোহমুক্ত। কিন্তু ঐ রকম মোহমুক্ত দেশে থেকে আমাদের দেশের ছেলেরা মোহযুক্ত হয়েই আসেন। ওদের দেশের নবীন যুবক যুবতীবা ওদের সকল অবস্থার মধ্যেই ওদের অবাধ মেলামেশায় সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশ করে। এই কিছু দিন আগে কলকাতায় ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম আমাদের দেশের বহু স্বামী স্ত্রী, বহু প্রৌঢ় কুমার-কুমারী, নোট বই হাতে ঘোড়ার রেকর্ড রাখছেন, এবং ধানী মদ ছেড়ে মানী মদই খাচ্ছেন। হাবে ভাবে সাজসজ্জায় জব্বর মানানসই অবস্থা। রেসকোর্সে এসে বসলেনও পাশাপাশি; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কেউ কারো খবর রাখবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কিন্তু কতকগুলি বিদেশী দম্পতিকে দেখলাম ওরা ঠিকই আছে,

স্ত্রীর হাত থেকে পেন্সিল পড়ে গেলে রীতিমত মাতাল পুরুষটি গ্যালারির নীচে ঢুকে ঐ পেন্সিল কুড়িয়ে দিচ্ছে। এই জীবনটাকেই আমি আন্তরিকতার চরম বলে মনে করি। যাকগে, বড্ড সুখী হলাম আপনার সাথে কথা বলে ; আশা করি আর একদিন আসবেন।

অনুকূল সান্ন্যাল এতক্ষণ নীরবই ছিলেন। ডাক্তারের 'সুখী হ'লাম' কথাটা শুনে সোৎসাহে বলে ওঠেন, ডাক্তারবাবু আমার এই ভাইপোটির ভেতর রয়েছে এ কালেরই আত্মপ্রাপ্ত রূপ।

সামান্য জলযোগের পর এঁরা বিদায় নেন। হরিনারায়ণের বাড়ীর গেটের কাছে গিয়ে অনুকূল বাবু একটু জোর গলায় ভাইপোটিকে বলেন, এই টোপটা যদি লেগে যায় তবে একেবারে লাখ টাকার মালিক। ডাক্তারবাবু শুধু টাকার কুমীর নন, একেবারে হাঙ্গর।

অদূরে ঝুমুরের কানে কথাটা প্রবেশ করবার সাথে সাথে একটা বিপরীত বুদ্ধির ব্যাপার ঘটে। ঝুমুর সান্ন্যাল মশায়কে লক্ষ্য করে ছোঁড়ে একটা মস্ত বড় ঢিল। বিলক্ষণ আঘাত পেয়ে 'বাপরে' বলে তিনি পথে বসে পড়েন। শব্দ শুনে ডাক্তার হরিনারায়ণ ছুটে আসেন। বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—

কি হলো আপনার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন ?

বিভূতি বিজ্ঞের মত বলে একটা ঢিল এসে ওঁর কপালে লাগলো।

ঢিল !····· ডাক্তার হরিনারায়ণ মুহূর্ত্তের মধ্যে কিছুটা আবিষ্কার করে ফেলেন। যা হোক ডাক্তারখানায় সান্ন্যাল মহাশয়ের কপালের ফেরের ওপর আরেকদফা ফেট্টি বেঁধে হরিনারায়ণ তাকে বিদায় দেন।

বাড়ীতে ঢুকে হরিনারায়ণ বজ্রকণ্ঠে ডাকেন, ঝুমুর !

ঝুমুর মুহূর্ত্তের মধ্যে পিতার সামনে উপস্থিত হয়।

—ঢিলটা কি তুমি ছুঁড়েছিলে ?

ঝুমুর নিরুত্তর।

—উত্তর দাও !

এবার ও চীৎকার করে বলে, ও বুড়ো দারোগা তোমায় হাঙ্গর বললে কেন ?

হরিনারায়ণ কর্কশ কণ্ঠে বলেন, যে যাই বলুক, বুড়ো মানুষকে জখম করা কি তোমার উচিত হয়েছে ? হাজার হলেও তুমি মেয়ে ছেলে। এখন থেকে নম্রতা, সহনশীলতা, ধৈর্য—এগুলোকে অভ্যাস করতে শেখো ! শেষের কথাগুলিব মধ্যে কড়া আদেশের ভঙ্গি ফুটে ওঠে।

ঝুমুর স্থির হয়ে আরো কিছু শোনবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

পরের দিন অনুকূলবাবু আবার এসে উপস্থিত হন। হাতের দারোগা লাঠিটা তিনবার খট্ খট্ করে মাটিতে ঠুকে বলেন, দেখুন ডাক্তারবাবু কেমন চমৎকাব পাত্র আপনাকে এনে দিয়েছি। এইবার দিন টিন একটা ঠিক করুন, পাকা দেখাটা হয়ে যাক।

—মাপ করুন অনুকূল বাবু, আমি ভেবেছি, আমার ঐ বুনো মেয়েটার জন্যে একটা বুনো বর এনে দেবো ; আত্মপ্রান্ত আধুনিকতা ওর ধাতে সইবে না। তাছাড়া, বিভূতিবাবুর বয়স ওর তুলনায় বড় বেশী।

—আরে মশাই কি বলেন, সতী সাধ্বী উমা বৃদ্ধ শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য কি সাধনাই কবেছিলেন !

—উমার সে মনস্তত্ত্ব বুঝবার ক্ষমতা ঝুমুরের এখনো হয়নি। তা ছাড়া উমার 'হর' সাধনা স্বামীর জন্য নয়, নিজেকে শক্তি রূপে প্রচার করবার জন্য। চতুরা স্ত্রীলোক বোমভোলা পতিই কামনা করে থাকে সংসারকে সহজে বসে রাখবার জন্য।, উমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। কিন্তু আমি চাইছি এমন একটি পাত্র যে আমার ঐ দুরন্ত মেয়েটাকে বশে রাখতে পারবে। সব কিছুর উপরের কথা আমি এ বিয়ে দেবো না।

অনুকূলবাবু নিজের মনোভাবকে গোপন করে বলেল—,তাইতো,. তাইতো, ডাক্তারকাবু, আপনার মেয়েতো আর ফেলনা জিনিষ নয় !

বুড়ো দারোগা বাড়ী গিয়ে ভাইপোকে শাসন করে বলে, বিলেত ফেরত, না হাতী ! এত ফ্রি মিক্‌সিং-এর বক্তৃতা দিলে বাংলা দেশে বিয়ে হয় না ! একি তোমার বিলেতের আয়া, ওয়েট্রেস পেয়েছ না কি ? এ মেয়ে ডাক্তার হরিনারায়ণের মেয়ে, যে হরিনারায়ণ হাঁ করলে পেটের কলকব্জা দেখে ফেলে ; তুমি গিয়েছ সেইখানে ফুটানি দেখাতে !

বিভূতির মুখোশ এক মুহূর্ত্তে খুলে পড়ে। চীৎকার করে বলে, দেখ কাকা ওসব বাজে কথা আমায় বলবে না, তোমার এখানে এসে আমি পিঁড়েতে বসে ভাত খাচ্ছি, নইলে দেখবে আমার জীবনের প্লান—এই দেখ আমার বাড়ীর নকসা, এই দেখ মোটর গাড়ীর ক্যাটালগ, আমাকে যা তা পেয়েছ নাকি ?

যা যা ঋণেধারে একেবারে ডুবে আছিস—তোর ও প্ল্যানে আমি হাজার বার ল্যাং মারি ! ফসল-ফলা জমিগুলো বিক্রি করে বিলেত গিয়ে একটা বাঁদর হয়ে এসেছিস। বাংলার মাটিতে পা দিয়েই ফ্রি মিকসিং ! হারামজাদা ! বাংলাদেশের কোনও মেয়ে তোর গলায় মালা দেবে না—আমিও বলে দিলাম।

অনুকূল সান্ন্যাল সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বিভূতি তার দিকে রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলে, অভদ্র, ইতর !

এক বৎসর পরের কথা। আকাশচারী একাকী বিহঙ্গ উড়ে চলেছে গতি তার দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে।

শীতের সন্ধ্যা। কনকনে হাওয়া দেহের প্রতি রোম-কূপে প্রবেশ ক'রে হাঁড়গুলো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলছে। উত্তরের হাওয়া তার ওপর খোলা মাঠ। তিনটি কিশোর ঝড়ের মত ছুটে চলেছে।

তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন বলে ওঠে ডাকু পালিয়েছে রে !

ডাকু ক্লান্ত স্বরে বলে—কঙ্কন আর না রে, ফিরে চ' সন্ধ্যে নামছে!
—তোরা ফিরে যা আমি যাব না।

রাধু বলে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে কঙ্কন। অনেক ছুটেছি, পেট একেবারে 'চোঁ' 'চোঁ' করছে।

কঙ্কন উপর দিকে তাকিয়ে দেখে সবই বট পাকুড় আর নিম গাছ; ফলের কোন আশা নেই। পাশেই বেড়ার উপর মাটি-লেপা ধোপাদের বাড়ী। বলে, চল দেখি খাবার মেলে কি না। কিছুক্ষণ উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বলে—রাধু, লম্বা লম্বা তিনটে পাঁকাটি জোগাড় কর, নয়তো পেঁপে গাছের ডাঁট। কথামত রাধু তিনটে মোটা মোটা পাঁকাটি জোগাড় করে আনে।

কঙ্কন আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, ঐ দেখ এক-কড়া সব-পড়া দুধ! তিন জনে এক সাথে চোঁ চোঁ করে টানবো, যার দম বেশী সেই বেশী খাবে।

ডাকু নাকি সুরে বলে, তবে ভাই তুমি দুধে পাঁকাটি পরে লাগাবে, নইলে এক টানে তো সবই খেয়ে নেবে।

কঙ্কন হেসে বলে, রেডি! এক, দুই, তিন!

কিছুক্ষণ পরেই দুধ-শূন্য দুধের কড়া, বুকে সরের প্রলেপটুকু নিয়ে কাঁদতে থাকে।

ডাকু বলে, কঙ্কন ইয়া পুরু সর কড়াতেই রয়ে গেল।

—ঠিক আছে ওটা ধোপা বউরা খাবে।

রাধু বলে, কেন ভাই?

—আমার বউকে ঠিক এই রকম ক্ষীরটুকু খেয়ে চাঁচিটুকু দেবো।

ডাকু অবজ্ঞার স্বরে বলে সে এত কম নেবে কেন?

—দেখ ডাকু আমার বউ তোর মত বোকা হবে না, ক্ষীর যদি খেতে দি, সে তখন বলবে, মেয়ে মানুষের এত ভাল ভাল খাবার খেতে নেই।

ডাকু বলে, এবার চল পালাই, নইলে ধোপা বউরা দেখে ফেলবে।

কঙ্কন বলে পালিয়ে যাব কেন রে, যাবার সময় চীৎকার করে বলে যাব, শুনছ ধোপা বউ, দুধটুকুন খেয়ে সরটুকুন রেখে গেলাম !

একই কথা চীৎকার করে বলতে বলতে তারা তিনজনে ছুটতে থাকে।

ঘর থেকে ধোপাবউ বেরিয়ে এসে শূন্য কড়া দেখে সংসারটাকেই শূন্যবোধ করে। সে চীৎকার করে বলে, খোকাবাবুরা, আমার কাছে চাইলেই পারতে—এমন এঁটো করে খেয়ে গেলে কেন ?

—ও কথা বাবাও বলেন, চাইলেই পারতিস, কিন্তু চাইলে কাঁচকলা ছাড়া কিছুই জোটে না। ও সব মিথ্যে কথা। খেয়েছি একদিন, রোজ কিন্তু খাব না।

ওরা তিনজনে এক সাথে ছুটে পালায়।

ধোপাবউ তার জাতব্যবসায়ের অনুরূপ ভাষায় বালকত্রয়ের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ সুরু করে দেয়।

সন্ধ্যা তখন তমসাবৃত হয়ে এসেছে। জোরে ছুটতে গিয়ে পায়ে খানিকটা লেগে যায়। কঙ্কন ওদের দুজনকে ডেকে বলে, আঃ! তোরা যে ছুটতেও পারিস না, এদিকে রাত যে নেমে এলো !

এত রাত হলো বাড়ীতে গিয়ে কি বলবো বলতো—ভয়ার্ত্ত স্বরে রাধু কঙ্কনকে বলে।

—আগে চোখদুটোকে খুব বড় বড় করবি, তারপর খুব জোরে জোরে হাঁপাত হাঁপাতে বলবি, ওরে বাবা ! ইয়া বড় সাপ তাড়া করেছিল !

ডাকু ঘাড় নেড়ে বলে,—উহুঁ, বিশ্বাস করবে না। কেন না, সেদিন বলেছিলাম ষাঁড়ে তাড়া করেছে, আজ যদি বলি সাপে তাড়া করেছে, তবে মেরেই ভব পার তরিয়ে দেবে।

কঙ্কন বলে, না রে বোকা ! বলবি মনসা পাড়ার সেই মরা গলি থেকে একটা ইয়া বড় সাপ, তার ল্যাজে সোনার মত কি চিক, চিক, করছে—এই না দেখে ছুঁড়লাম একটা ঢিল, বাবারে !

আর যাবে কোথা—প্রাণ যে বাঁচাতে পেরেছি, মা মনসার কৃপার জোরে। এই বলে বারে বারে কপালে হাত ঠেকাবি। এই যদি করতে পারিস, তোর মা কেন, মায়ের মা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা তিনজনে যার যার বাড়ীতে পৌঁছে যায়।

অনাদি ভাদুড়ী দেবলপুরের বিখ্যাত জমিদার। ভয়ে অনেক মাতব্বরই ভাদুড়ী মহাশয়ের সামনে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা-প্রসূত গাম্ভির্যের মোটা খোশটা টান মেরে খুলে ফেলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কঙ্কণ। অশান্ত ছেলেটি তার পিতার মোটাসোটা গম্ভীর চেহারার ভেতর কোন ভয়ের জিনিকই খুঁজে পায় না।

কঙ্কন বালক নয়, কিশোর, গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। ওর বড় ভাই সরোজ টাটার টেকনিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর শিক্ষা-নবীস! ওদের দু'জনের চেহারা আর প্রকৃতিতে দারুণ বৈষম্য; কিন্তু মনের মিলের অভাব দেখা যায় না। কঙ্কনের স্বভাবটা শৈশব থেকেই অদ্ভুত।

বাড়ীতে ঢুকেই কঙ্কন খাবার ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করে—ভজুয়া! আমার খাবার কোথা?

ভজুয়া ওদের বাড়ীতে অনেক দিন ধরে কাজ করছে! কঙ্কনের মেজাজ ও একটু-আধটু বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে বলে,—ছোটদাদাবাবু! আজ ঠাণ্ডাটা বেশ কনকনে। একটু চা, পাঁপড়, আর বেগুনী তৈরী হয়েছে, খাবে কি?

—বাঃ মন বুঝে খাবার করেছো!

ও সামনে খাবার পেয়ে খেতে থাকে।

ভজুয়া প্রশ্ন করে, এত শীতে কোথায় গিয়েছিলে দাদাবাবু?

—শেয়ালনী ধরতে।

সে কি! শেয়ালনী কি ধরতে আছে, ওরা যে ভগবতীর অংশ! সেদিন শোন নি শিবা-ভোগের কথা?

—ভগবতী টগবতী আমি বিশ্বাস করি না। তবে তুমি যদি বল জগতের সমস্ত স্ত্রী জাতি শেয়ালের জাত, তবে আমি বিশ্বাস করি, কেন না, শেয়ালনী হোক বেড়ালনী হোক—যাই হোক সমষ্টিমাত্রেই একটা শক্তি রাখে।

—সেকি দাদাবাবু! স্ত্রীলোক হচ্ছেন জননী, আছ্যাশক্তি—

—হতে পারে কালী। কিন্তু কালী কি করেছেন বলতে পারিস্ সতী-শব কাঁধে নিয়ে মহেশ্বর পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেগতিক দেখে দেবতারা বাহান্ন ভাগে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললে। পরে ঐ মহাদেবই আবার উমার মত পত্নীরত্ন লাভ করে উমাপতি হলেন, আমাদের দেশে যাকে এড়িয়ে আসতে হবে তাকেই ঠাকুব ঘরে দেবদেবীর সামনে বসিয়ে রাখা হয় যে ঘরে ফুল-চন্দন তেলের প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই জন্যেই সতীর দেহ-খণ্ড যেখানে পড়েছে সেই স্থানই পীঠস্থান হয়েছে। সতী যদি জানতেন, যে উমা এসে মহেশের হৃদয়-রাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী হবেন আর উনি হবেন মাটির কালী, তবে কিছুতেই উনি পতি নিন্দা শুনে অপমানের আঘাতে দেহত্যাগ করতেন না। কেননা দেবতারা ওঁকে দক্ষ রাজার চাইতেও বেশী অপমান করেছেন। এই পীঠস্থানগুলো সতীর মানদণ্ডের মহিমাকে ছোটই করেছে, বাড়ায়নি।

—আরে রাম! রাম! কি যে তুমি বল এসব কথা শুনলেও পাপ হয়!—ভজুয়া কানে আঙ্গুল দেয়।

ওর হাতটা জোর করে কান থেকে সরিয়ে দিয়ে বলে, আহা, বুড়ো বয়সে ন্যাকামী হচ্ছে, না? আগে কানে আঙ্গুল দিসনি কেন, সব শুনে নিয়ে কানে আঙ্গুল দিচ্ছিস!

চায়ের পেয়ালা দেখে কঙ্কন বলে, আচ্ছা ভজুয়া, একশ দিন

তোকে বলেছি রোজ রোজ আমায় ঐ একই পেয়ালায় চা দিবিনে। কিন্তু রোজই কথাটা তুই ভুলে যাস্!

ভয় পেয়ে ভজুয়া বলে—কি করবো বল? তুমি যা চাইছ, তা করতে গেলে ত্রিশ দিন ত্রিশটে পেয়ালা লাগে। বাবু অত পয়সা দেবে কেন?

—পেয়ালার পয়সা না দিক, রোজ তুই মাটির ভাড় কিনে আনতে পারিস—কোনটা কালো মাটি, কোনটা পোড়া মাটি, কোনটা চিনে মাটি—এতে তোর বেশী পয়সা লাগবে না।

—তোমার যত কথা, চা তো শীত ভরে খাচ্ছ, একই চা রোজ খাচ্ছ এক পেয়ালাতে খেতেই যত অপরাধ!

—আঃ! এসব কথা তুমি বুঝবে না। চা খেতে আমি ভালবাসি তাই খাই। কিন্তু চায়ের গন্ধটা ভিন্ন পাত্রে পড়লে ভিন্ন রকম হয়। যেমন মাটির পাত্রে পড়লে বেশ সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসে, পাথরের বাটিতে খেলে তীর্থযাত্রীর মত মনে হয়, দামী পেয়ালায় খেলে কেমন বিদেশী বিদেশী ভাব জাগে, পেতলের গ্লাসে খেলে কুলি বস্তির গন্ধ পাই। এইবার বুঝলি?

—হ্যাঁ দাদাবাবু বড় হয়ে কটা বিয়ে করবে বলতো?

একটা, কঙ্কন আঙ্গুল দেখিয়ে বলে।

রোজ রোজ বিয়ে না করে শুধু একটা বিয়ে করবে কেন? ভজুয়া রসিকের মত প্রশ্ন করে?

—এই একটা বিয়ে করাটা আমার অহঙ্কার।

অহঙ্কার কেন? তোমার বাবার প্রথম দু'গিন্নি মরে যেতে তোমার মাকে আবার বিয়ে করলেন।

তিনি করেছেন তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু আমি করবো না। কেন করবো না জানিস? প্রথম যখন বিয়ে করবো, তখন বউটা আমার নূতন আমিও বউটার কাছে নূতন; যা দেবো, তাও নূতন। ধর সে বউটা আমার মরে গেল আবার যাকে বিয়ে করবো, সেও

আমার কাছে নূতন, আমিও তার কাছে নূতন ; কিন্তু ভালবাসার কিছু দিতে গেলেই পুরনো বউটার গন্ধ একটু একটু ভেসে আসবে। এই পুরনো পচা গন্ধের ভয়েই আমি আর বিয়ে করবো না।

ভজুয়া খুব জোরে হেসে উঠে বলে—তুমি বিয়ে করলে,' বেঁচে যদি থাকি, তোমার বউকে এসব গল্প গিয়ে শোনাব।

তার পর একটা একটা করে দিন গিয়ে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। ছোট্ট চারা গাছটা ফল-প্রসূ হয়েছে ; বুধি গাইয়ের বাচ্চাটার বাচ্চা হয়েছে ' গোয়াল ঘরের ছাদের নূতন রাঙ্গা খোলাগুলো শ্যাওলা ধরেছে ; রঙের বাক্সের কোন রঙের সাথেই এ রঙের মিল নেই। ও বাড়ীর কুসুমির আটসাঁট দেহের বাঁধ কেমন একটু থলথলে হয়েছে ; ও এখন তিনটি ছেলের মা। ডিষ্ট্রীক বোর্ডের নূতন মাটি ঢালা রাস্তাগুলোতে জায়গায় জায়গায় আবার খাল বিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, নূতন বাড়ীর দেয়ালে আবার চুণ ফেরানো হচ্ছে। গ্রামের পশ্চিমের ডোবাটা কচুরিপানার ঘন দামে অন্তঃসলিলা রূপ ধরেছে। মুন্সি বাড়ীর দন্তহীন প্রবীণ বুড়ো হয়তো আবার জন্মে' কোন মায়ের কোলে বসে বসে কাঁচা-পেয়ারা খাচ্ছে। পাঁচটা বছর তো কম নয় !

কঙ্কন এখন কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ছে। গ্রীষ্মের বন্ধে সে এই মাত্র গাড়ী থেকে নেমেছে।

কঙ্কনের গৃহ প্রত্যাবর্তন আর চেঙ্গিস খাঁয়ের ভারত আক্রমণ প্রায় এক পর্য্যায়ে দাঁড়ায়। গাড়ী থেকে নেমেই কঙ্কন ছোট ভাইটির ফুলো ফুলো গালে এমন করে চুমো খায় যার ফলে পরক্ষণেই তার গালে টিনচার বেঞ্জিনের প্রলেপ দিতে হয়। দ্বিতীয় ভাইটিকে আদর করে এমন জোরে কিক্ মারে, যার ফলে তার সামনের আধনড়া দাঁত দুটো একেবারে মূল সমেত উঠে আসে। ছোট ভাই ঝণ্টু

ব্যাপার দেখে অন্তঃপুরে মায়ের আঁচলের নীচে ঢোকে। মা ছুটে এসে এক গাল হেসে বলেন, হ্যাঁরে পাগল, একি হচ্ছে, একটার দাঁত ছুটিয়ে দিলি, একটার গাল কামড়িয়ে দিলি, আর একটাতো ভয়ের চোটে ভাঁড়ারে ঢুকেছে।

কঙ্কন হেসে বলে, এতগুলো খেলনা আর লজেনচুস কি এমনি এমনি মিলবে নাকি? সবগুলো চকোলেট খেলনা আর লজেন্স হাতের উপর তুলে ধরে বলে, যে বেশী মার খাবে সে বেশী জিনিস পাবে। দাঁত পড়া ভাইটি দাঁতের রক্ত আঙ্গুল দিয়ে টেনে বের করে, বলে—এই দেখ, তবে আমি বেশী পাব!

সমস্ত বাড়ীটায় একটা হাসির রোল উঠে। কথা বলতে বলতে কঙ্কন কলকাতা থেকে কিনে আনা জিনিসগুলো বাক্স থেকে বার করে, সবার শেষে বার করে পাতলা নেবু রংয়ের একখানা সিল্কের শাড়ী।

—বাঃ! শাড়ীখানা তো খুব সুন্দর! এ রকম শাড়ী এখনো এখানে কেউ পরেনি—মা বলেন।

—শাড়ীটা তোমার জন্য এনেছি।

মা হেসে বলেন আমার জন্য রঙিন শাড়ী, তোর যেমন বুদ্ধি!

—কেন রঙিন শাড়ী পরলে কি হয়?

—কি হয় তা কি জানি, তোরা বড় হবার পর আমি রঙিন শাড়ী পরা ছেড়েই দিয়েছি।

বারান্দার ওপাশে কঙ্কনের পিস্তুতো বোন চুল বাঁধছিল। কঙ্কনের কথার উত্তরে হেসে বলে, মামীমা, এ ছেলেটা সত্যি তোমার পাগল!

কঙ্কনের জননী হেসে সে স্থান ত্যাগ করেন। মা চলে যাবার পর কঙ্কন প্রশ্ন করে, আচ্ছা মেজদি, রঙিন শাড়ী পরলে কি হয় বলতে পার?

মেজদি বিজ্ঞের মত বলেন, বড় বড় ছেলেমেয়েদের সামনে রঙিন শাড়ী পরতে লজ্জা হয়। এই দেখ না মায়ার মা রঙিন শাড়ী

পরেন, এই নিয়ে পাড়ার মেয়েমহলে সে দিন একটা বিরাট জটলা হয়ে গেল !

—মায়ারা ক ভাই বোন—কঙ্কন প্রশ্ন করে।

—তা ৬ ৭টি হবে।

—বড়টির বয়স কত ?

—এই উনিশ কুড়ি।

—আর ছোটটি ?

—এই বছর খানেকের।

—ও, ঐ আঠারো উনিশ বৎসরের সন্তানের সামনে এক বৎসরের শিশুর জন্ম ইতিহাস রচনা করতে লজ্জা হলো না, লজ্জা যত রঙিন-শাড়ী পরার ব্যাপারে ! তোমাদের বিকৃত বুদ্ধির বিচারে সবই উৎকট। এটা করতে হয় না, ওটা করতে হয় না, এইটাই জান ; কিন্তু কেন করতে হয় হয় না, এ কথা নিজের মনকেও কোন দিন প্রশ্ন কর না !

কিছুক্ষণ পরে কঙ্কন হাত পা ধুয়ে খেতে বসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, বাবাকে বলে বাড়ীর অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন করবো ভাবছি, তোমার এতে মত আছে ?

মা একটু হেসে বলেন, মত আর অমত—এ কথা দুটো শুনলেই আমার হাসি আসে। আমার নিজস্ব ধারণা, জগতে কেউ কারো মতে চলে না ; কেন না প্রত্যেকেই চায় অপরকে নিজের আয়ত্তে রাখতে। যে প্রতাপশালী, দুর্বল তাকে সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু মেনেই নেয় মাত্র, কোন দিন আবার সেই দুর্বল সবল হ'য়ে তার শক্তির পরিচয় দিতে ত্রুটি বোধ করে না ; তাই বলছি, সবল মত চায়, আর দুর্বল মত দেয় ; সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমার মত আছে, কেন না আমি তোমাদের মা।

—তাই যদি হবে, তবে তুমি তো আমার চাইতে অনেক সবল। বাবা গো, চুলের ঝুঁটি ধরে যখন পিণ্টার পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দাও, তখন তোমাকে দেখলে মনে হয় জামদগ্ন্য ঋষি !

মা হেসে বলেন, ঠিকই বলেছ, তিন বৎসরের পিণ্টার ওপর আমার প্রভাবটা প্রায় অখণ্ড বললেই চলে; কিন্তু ঝাণ্টুটাকে মারতে গেলে ও চেষ্টা করে আমার হাত দুটোকে চেপে ধরবার, আর বড়টাকে মারতে গেলে দৌড়ে রাস্তার উপর গিয়ে বলে, মেরো না বলছি, ভাল হবে না ! তাই বলছিলাম, যারা আমার মতে চলে, তারা শিশু, দৈহিক শক্তিতে তারা আমার চাইতে দুর্বল, তাই তারা আমার মতকে সমীহ করে চলে।

কঙ্কন হেসে বলে, ও, বুঝেছি, ইঙ্গিতে তুমি বলতে চাও আমরা তোমাকে মেনে চলি না, যেহেতু আমরা বড় হয়ে গিয়েছি। এটা কিন্তু তুমি অন্যায় কথা বলছ। বরঞ্চ এই কথাটা বল যে তোমার স্নেহ-ভালবাসার দুর্বলতা আমাদের সব অন্যায়কে মেনে নিয়েছে।

ভাইগুলো একে একে খাবার সামনে এসে জড়ো হয়। মা ধমক দিয়ে বলেন, যা তো তোরা এখান থেকে—খেয়ে দেয়ে ও একটু জিরিয়ে নিক।

জননীর রক্ত আঁখি দেখে ছোট্ট সৈনিক দলটি রণে ভঙ্গ দেয়।

—ওরা তোমায় বড্ড জ্বালায়, না মা ?

তা আর বলতে ! ঐ পিণ্টের উপদ্রবটাই বড্ড বেশী ; ওর ধারণা ওর মা ওকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসে না।

কঙ্কন হেসে বলে, পিণ্টেটা দেখছি বুদ্ধিমান, মায়ের সত্য রূপটা বুঝে ফেলেছে।

মা প্রতিবাদ করে বলেন, কি যে বলিস বাছা, মায়ের চোখে সবাই সমান।

—কিন্তু মায়ের চোখের উনিশবিশের মধ্যে যে ষোল আনার ব্যবধান আছে সেটা কিন্তু বড় কম নয়।

কথাঠা শুনে মা একটু হাসেন মাত্র।

কঙ্কন পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে বাইরে বেরিয়ে যায়। মা কঙ্কনের

আনা নূতন জিনিসগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে দেখতে থাকেন। তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা দৃষ্টি-দর্পণে ফুটে ওঠে।

পুরনো বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডাটা জমে উঠেছে। সদা হঠাৎ বলে ওঠে, হ্যাঁরে, সরোজের নাকি বিয়ে?

ডাকু চোখ পাকিয়ে বলে, আঃ চুপ কর না, ওসব কথায় আমাদের দরকার কি?

—বটে আমাদের দরকার নেই, টাকার জন্য শেষটায় একটা শাকচুন্নি!

কঙ্কন বলে, আগে কথাটা খুলেই বল, তারপর মুখ খারাপ করিস। ডাকুর দিকে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে?

—না, না, ওসব কিছু না ওসব বাজে খবর।

কঙ্কন ধমক দিয়ে বলে, রাখ তোর ভণিতা, খুলেই বল না কি ব্যাপার?

জটা বলে, এমন কিছু না, তোর বাবা সরোজের বিয়ে ঠিক করেছেন।

—ভালই তো, বিয়ে হলে দাদার এত বয়সেই বিয়ে হওয়া উচিত, তা এতে তোরা ক্ষেপে উঠেছিস্ কেন?

—মেয়েটা ভাই ভারী কুৎসিত। তাতেও বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটিকে মেনে নেবার পেছনে রয়েছে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত।

—বাবা বুঝি অনেক টাকা নিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু তোদের টাকা খায় কে, তার অন্ত নেই; আবার পরের টাকার উপর শ্যেন দৃষ্টি কেন।

—ওটা তোরা বুঝবিনে, পরের টাকা নেয়াটা মানুষের একটা হবি, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—কঙ্কন বলে।

কথাটা শুনে অবধি কঙ্কনের মনটা খচ খচ করতে থাকে। বাড়ীতে এসে পিতাকে প্রশ্ন করে, দাদার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটা ঠিক সময় পাব তো ?

অনাদি ভাদুড়ী গড়গড়ায় টান দিতে দিতে বলেন, আরে, তোরা না খেলতে গিয়েছিলি কুসুমপুরে, সেই কুসুমপুরের হরিনারায়ণ মৈত্রের মেয়ে— দোষের মধ্যে রঙটা একটু ময়লা।

—তাতে কি হয়েছে, শুনলাম অনেক টাকা দেবে তারা। আমাদের মানুষ করতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছো—এইবার সেটা পূরণ হয়ে যাবে। বিয়েটা আমারো লাগিয়ে দিও, এক সাথে জোড়া পাঁঠা বলি দিলে মা কালী ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। তুমি আর মা দু'জনে সে পূজার প্রসাদ পেও।

কথাটা কঙ্কনের মায়ের কানে যেতেই তিনি কঙ্কনের কথার উত্তরে বলেন, এ পাত্রী নির্বাচনে মায়ের কোন মত বা অমত ছিল না, বাবা !

—মায়ের আসনে বসে সত্তাহীনতার পরিচয় দেওয়া খুব গর্বের কথা নয়।

—কিন্তু তোমার বাবা আমার মতের প্রতীক্ষা কোন দিন করেন না, এ কথাটা কি তোমরা এখনো বোঝনি ?

—বুঝেছি বলেই দুঃখ হচ্ছে। কঙ্কন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মনীষা বলেন—সরোজের বিয়ে ওখানে না হওয়াই ভাল, ওদের নিষেধ করে দাও।

কিন্তু মেয়েটির সমস্ত সদগুণ কি শুধু কালো হবার অপরাধে ঢেকে যাবে ? আর তা ছাড়া ছেলেদের মতেই আমাকে চলতে হবে নাকি ?

—যাকে বিয়ে দেবে সে যদি বিয়ে করতে না চায় ?

—সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা, সরোজকে আসবার জন্য টেলিগ্রাম করেছি, সে এসে পড়লেই দু'ভাই মিলে মেয়েটিকে দেখে আসুক, পরের কথা শুনে নাচবার কোন প্রয়োজন নেই।

ব্যবস্থামত সাত দিন পরে কঙ্কন আর সরোজ কুসুমপুরে পাত্রী দেখতে রওনা হয়।

ওদের গ্রাম থেকে কুসুমপুরে নৌকো করে যেতে হয়—ছইয়ের নৌকা। কঙ্কন ভেতরে বসতে আপত্তি করে, বলে, আয় না দাদা নৌকার পৈঠাতে একটু বসি!

জলগুলো তখন দক্ষ মাঝির বৈঠার টানের পর ঘুরে ঘুরে গোল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা জলবৃত্ত তৈরী করছে। একটা বাচ্চা মাঝি ভারী মিষ্টি সুরে ভাটিয়ালী গান ধরেছে। গাজনের ভাঙ্গা মেলার মাঠটায় এখনো দু একটা চালা ঘর বাঁধা আছে, চালগুলো উড়ে গিয়েছে কাল বৈশাখীর ঝড়ে; হাঁ-করা ঘরটা এক গণ্ডুষে আকাশ-পানের স্পৃহা জানাচ্ছে। পারের ঘাটে মেয়েরা নাইতে এসে কলসী ভাসিয়ে গোল হয়ে গল্প সুরু করেছে।

ওদের নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

বাঙ্গালার বাড়ীর মেয়ে দেখানো একটা পর্ব বিশেষ। ফলের দোকানে টাটকা ফলগুলোকে সামনে সাজিয়ে রেখে শুকনো দাগধরা ফলগুলোকে থলে চাপা দিয়ে দোকানদার যেমন তার দোকান জাঁকিয়ে বসে, মেয়ে দেখাবার পালাটা অনেকটা সেই রকম। ঝি চাকরেরা সসব্যস্ত, মোজেক-দেওয়া বাইরের ঘরের রূপ এতদিন ধূলবালুতে লুকিয়ে ছিল; সোডা দিয়ে ঘর ধোবার পর ওদের যৌবনশ্রী পুনরুদ্ধার হলো। ঝুমুরের মাতৃ-বিয়োগের পর এ ঘরের প্রসাধন এই প্রথম। ঘরের মাঝখানে নীচু চার কোনে স্প্রীংএর সিট্, তাতে দামী গালিচা পাতা; চার কোনে চারটি ছোট তেপায়া টেবিলে ফুল গুচ্ছভরা ফুলদানি; ঘরের এককোণে ছোট অর্গান। প্রকাণ্ড life sizeএর দেওয়াল-আয়না। অর্গানের সামনে ভেলভেট অর্গান সিট্। দরজার ছাপা গোলাপী ফুলের

পরদাগুলো, ঘরের শ্রী আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একপাশে ব্যাটারী রেডিও; পেতলের টবে চারটি পাতা-বাহার গাছ; জানালার কাচের ভেতর দিয়ে সূর্য-রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। চূণ ও স্পিরিটের ঘষা খেয়ে ওরাও আজ সুসভ্য হয়েছে; পানের পিচ আর শুকনো চূণের দাগে ওরা এতদিন পক্সের রোগীর মত হয়েছিল। দেওয়ালে ওঁ দেওয়া মা কালীর ছবি ঘরের আধুনিক রুচিকে এক চাটিতে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও আগন্তুকের প্রথম দৃষ্টি ঐ ওঁ লেখা ছবির ওপরেই আকৃষ্ট হচ্ছে। আয়নার উপরে ছবিটি প্রতিফলিত হয়ে সারা ঘারটাই ওঁ হয়ে উঠেছে। ঘরটার সামনে বিরাট বারান্দা; তারই একপাশ দিয়ে অন্তঃপুরের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে; বারান্দার লাল সিমেণ্টে ফাটল ধরেছে; ফাটলের গহ্বরে সারি দেওয়া পিপঁড়ে চলতে চলতে মুখে মুখ ছুঁইয়ে প্রেম নিবেদন করছে; আবার কোনটা বা মানুষের পায়ের চাপে পরম গতিলাভ করছে। ওদের শোণিতহীন দেহ-সমাধি কারো দৃষ্টিকেই আকৃষ্ট করে না। অহিংসা পরম ধর্ম, ওদের জন্য নয়।

মেয়ে মহলে শাড়ী আর গয়না বাছা নিয়ে একটা বিরাট মতভেদ দাঁড়িয়ে যায়। ওদের রাজনীতির লড়াই স্বামী সংসার আর সাজসজ্জা নিয়েই বরাবর বেঁধে থাকে। ওদের জন্য 'vote for'এর প্রয়োজন হয় না। স্বামীস্ত্রীতে এক বালিশে শুয়ে ওরা ভোটের হার জিৎ নেয়। যে হেরে যায় সে ঘন ঘন বাপের বাড়ীতে যাতায়াত করে' সংসারে আসক্তিহীনতার পরিচয় দেয়; যে জিতে যায়. আঁচলে চাবি বেঁধে ঘন ঘন পান দোক্তা খেয়ে সংসার-সিংহাসনে মহারাণী হয়ে পাড়ার পার্‌লামেণ্টে ঘাড় নাড়বার অথবা ঘাড় কাত করবার অধিকার পায়।

ঝুমুরের খুড়তুতো বোন ঝুনুর উপর পাত্রীর প্রসাধনের ভার পড়েছে। কোন কোন হাত-টান মেয়ের আবির্ভাবে জ্যেঠাইমা সতর্ক দৃষ্টিতে ঝুমুরের জননীর গয়নার বাক্স পাহারা দিচ্ছেন। ঝুমুরের প্রসাধনের জন্য গয়নার বাক্স আজ প্রথম খোলা হয়েছে।

ঝুমুরের মুখ আজ ঈষৎ লজ্জাবনত। সর-ময়দা ঘষে এইমাত্র

স্নান সেরে এসেছে। ঝুনু ওর চুল বেঁধে দিচ্চে। টানা আঁটসাঁট কান-বার-করা চুল বাঁধা দেখে জেঠাইমা পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ জানিয়েও বিফলকাম হচ্ছেন। তবু আবার তিনি বলেন, অমন টেনে চুল বাঁধলে মুখটা 'পুরুষ পুরুষ' লাগে।

ঝুনু প্রতিবাদ করে বলে,—কি যে বল বড়মা, আজকালকার মেয়েরা টেনে চুল বেঁধে জুলফি বের করে দেয়, যার একদম জুলফি নেই, সে খুর দিয়ে চেঁচে জুলফি বানিয়ে নেয়।

—ওমা! জেঠাইমা গালে হাত দেন।

—ওমা কি, যে-যুগের যা, তা তোমাকে মেনে নিতেই হবে। তোমাদের যুগের জল আর গামছা দিয়ে থাক পাতার চুল বাঁধা অনেক দিন উঠে গিয়েছে। আজকাল হয়েছে ব্যাকব্রাস্ বব্ড্ আর টাসেল বিনুনি।

হার মেনে জেঠাই মা বলেন, তা বাছা তোরা যা ভাল বুঝিস তাই কর।

তার পর সুরু হয় মাজাঘষার পালা। স্নো, পাউডার, কাজল, সর্বোপরি পান থেঁতো করে আঙ্গুলে টিপে টিপে রস বের করে ঠোঁটে লাগাবার ভঙ্গিটি সত্যি দর্শনীয়।

ঝুমুরের বন্ধু মঞ্জু বলে, মেজদি ঐ বাদামী রংএর শাড়ীটা ওকে পরিয়ে দাও না।

তুই থাম, কি মানায় না মানায় আমি বলে দেবো। বেছে বেছে ও একখানা ম্যাজেনটা রঙের সাড়ী বের করে বলে, এই রঙটা আজকাল খুব চলে।

ঝুমুর কিন্তু এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। ঝুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, কালো রঙে এটা মানাবে না, মায়ের একটা ভালো সাদা শাড়ী আমায় পরিয়ে দাও না!

—ওমা, সেকি! পোড়ারমুখীর বিয়ের সাধও আছে আবার বৈরাগী হবার সাধও আছে।

বাধ্য হয়ে ঝুমুর ঝুনুর মনোনীত শাড়ীটিই পরে মডার্ণ 'হবল' দিয়ে। ওর সাজটা সত্যি সত্যি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে ঝুনুর নিপুণ হস্তের একাগ্রতায়।

ম্যাজেনটা রঙের শাড়ী, লাল রঙের ব্লাউস, হাতে জড়োয়া "মানতাসা", গলায় জড়োয়া সরু চিক ; কানে মুক্তোর ঝুমকো, হাতে জেড্ পাথরের বড় আংটি। ঝুমুর নিজেকে আয়নার সামনে এই প্রথম সুন্দর দেখে।

এ বাড়ীর 'ন' বউ ঝুনুর রুচির প্রভাবটা একেবারেই সহ্য করতে না পেরে, খুঁত বার করে বলে, উপব হাতে কিছুই পরালে না, ঠাকুর ঝি ?

ঝুনু শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে ও নিজেকে বিজ্ঞ অধুনিকা বলেই প্রচার করে। ওর দাদা বাপ-বাঙ্গালী-মা-মেমের মেয়ে বিয়ে করেছে ; ওর বোন কলকাতার কলেজে পড়ে ; সুতরাং কলকাতার অধুনিক পাঁজরগুলো ও একটা একটা করে ব্যাখ্যা করতে পারে—ওর এই রকম ধারণা।

—যাদের একটু রুচি আছে, তারা উপব হাতে কৃষ্ণচূড়া পরে কৃষ্ণের বিরাগ ভাজন হয় না, ঝুনু উত্তর করে।

—জানো, আমার মেম-বউদি উপর হাতে তাবিজ পরে !

—মেমেরা গিল্টি গয়না পরতে অভ্যস্ত, তাই অনেক সোনার মালিক হয়ে সোনার বেণেদের মত সাজসজ্জা করে।

অপ্রত্যাশিত উত্তরে 'ন' বউ সেদিনেব মত পরাজয় স্বীকার করে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার হরিনারায়ণের কণ্ঠ শোনা যায়। তিনি ঝুনুকে ডাক দিয়ে বলেন ঝুনু বরের ভাই আর বর এসেছে।

কথাটা শুনে হুড় হুড় করে মেয়েব দল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বর দেখবার আশায়।

এই বর দেখবার মোহটা ওদের চিরন্তনী। পরের বর দেখে ওরা

নিজের স্বামীকে গিয়ে বলে, যাই বল বাপু প্রথম দিন তোমায় যেমন দেখেছিলাম এমনটি আর কাউকে দেখলাম না !

বর্বর পুরনো বরগুলো কথাটা শুনে একগাল দাড়িতে ক্রীম ঘষে সেদিন বাইরে যায়।

হরিনারায়ণ ঝুমুরকে তৈরী দেখে বলেন, এস মা, আমার সাথে এস।

ঝুনু একরাশ পাড়া-থেকে-কুড়িয়ে-আনা সেলাই হরিনারায়ণের হাতে দিয়ে বলে, জ্যাঠামণি এইগুলো দেখিয়ে বলো, মেয়ে আমাদের সেলাইফোঁড়াইএ খুব নিপুণ। হরিনারারণ একটু এগিয়ে যেতেই ঝুমুর প্রতিবাদ জানিয়ে ঝুনুকে বলে, সেজদি বর ভোলাতে বুঝি অনেক মিথ্যে বলতে হয় ! ও সেলাইগুলো আমি কস্মিন্‌কালেও করিনি।

—চুপ কর পোড়ারমুখী !

ঝুমুর আর কোন কথা না বলে পিতার পিছু পিছু চলতে থাকে। ঐটুকুন হাঁটতে ঝুমুরের পা দুটো জড়িয়ে জড়িয়ে আসতে থাকে।

বাইরের ঘরের দরজার পরদা তুলে ধ'রে হরিনারায়ণ বলেন, এস মা, লজ্জা কি ! যাঁরা এসেছেন, তাঁরা আজ আমাদের অতিথি।

কথাটা শুনে ঝুমুরের লজ্জাটা একটু সরল হয়ে আসে। ঝুমুর ঘরে ঢুকতেই সরোজ একবার তাকিয়েই মুখ নীচু করে কাগজ পড়তে সুরু করে।

কঙ্কন চাপা সুরে বলে, এই দাদা, এখন কাগজ পড়া রেখে দে, ওরা এসে পড়েছে !

মৈত্র মশায় কোন রকম ভূমিকা না করেই বলেন, মেয়েটি আমার খুব লাজুক নয়। ওর সাথে কথা বলে হয়তো আপনারা খুসী হবেন।

ঝুমুরকে অর্গান-সিটটা দেখিয়ে তিনি বলেন, মা তুমি এইখানে বসো, আমি এখনি আসছি।

সরোজ কাগজ পড়ছে। কঙ্কন চিমটি কেটে তার নিবিষ্টতা ভাঙ্গতে না পেরে নিরুপায় হয়ে ঝুমুরকে বলে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আপনি বস্থন, ইনি আমার দাদা শ্রীমান সরোজ কুমার ভাদুড়ী, আর আমি ওঁর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান কঙ্কন ভাদুড়ী।

ঝুমুর হাত জোড় করে নমস্কার করে বলে, পাড়ার সবাই আমায় ঝুমুব বলে ডাকেন।

—বাঃ বেশ মিষ্টি নামটি তো আপনার! আপনারা বরাবর কুস্থমপুরেই থাকেন?

হ্যাঁ কুস্থমপুরেই আমাদের জন্ম, মাঝে মাঝে কখনে-সখনো বাবার সাথে কলকাতায় যাই।

—আমরা ছোট বেলায় এখানে একবার ইণ্টার-স্কুল হকি খেলতে এসেছিলাম ধপধপে সাদা পালতোলা নৌকা চড়ে।

হ্যাঁ বাবাও তাই বলছিলেন, আর আমারও বেশ মনে আছে, ফ্রক পরে বাবার হাত ধরে খেলার মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

একটু অপেক্ষা করে কঙ্কন বলে, আমার মা গান শুনতে ভীষণ ভালবাসেন। গান শোনাতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?

—না গান আমি নিজেও খুব ভালবাসি।

ঝুমুর গান গায়। মধুর কণ্ঠের স্থর-মূর্ছনা সারা ঘরে বাতাসের মত পরদার স্তরে স্তরে খেলতে থাকে। গানটা শেষ হলে কেমন থমথমে ভাব এসে পড়ে। থমথমে ভাবটাকে কাটাবার জন্য কঙ্কন বলে, আমার দাদা ভয়ঙ্কর পড়াশুনা ভালবাসেন।

—ও বিষয়ে আমি আপনাদের কাউকেই স্থখী করতে পারবো না। গ্রামের স্কুলে মাইনর পর্যন্ত পড়ে' আর পড়বার স্থযোগ পাইনি। ঘরে যা সামান্য ইংরাজী পড়েছি, সেটা বলবার মত কিছু নয়। তবে নভেল-পড়া বাতিকটা আমার খুব বেশী, নভেল পড়ে মাঝে মাঝে সে-গুলোকে স্বপ্নও দেখি।

কঙ্কন ওর কথা শুনে হাসতে থাকে।

সেলাইগুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে কঙ্কন বলে, এগুলো আপনি করেছেন বাঃ চমৎকার হয়েছে তো ?

ঝুমুর হ্যাঁ-না বলে কথাটিকে এড়িয়ে যায়।

কঙ্কন বলে, মায়ের মুখে গল্প শুনেছি এক ভদ্রলোক তার পুত্র-বধূ চয়ন করবার মানসে সারা বাংলা দেশ চষে ফেলেছিলেন, এবং প্রত্যেকটি মেয়েকে নাকি একই প্রশ্ন করতেন এবং ঐ একটি প্রশ্ন তাঁর প্রথম আর শেষ প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নটা হচ্ছে এই—'মা তুমি মোচার ঘণ্ট রাঁধতে জান'? তা আমাদেরও প্রথম নয় শেষ প্রশ্ন রান্নাবান্না আপনাকে নিশ্চয়ই করতে হয় না ?

—সপ্তাহে একদিন রাঁধতে হয় ; বাবা রোববার করেন, নিরামিষ রান্না ঘরে সেদিন আমাকেই ঢুকতে হয়। উনি আমার হাতে ছাড়া কারো হাতে খান না।

—এভাবে আপনাদের বিরক্ত করা সত্যি বড় অন্যায়, কিন্তু আমাদের দেশে এইটাই রীতি।

ঝুমুর হেসে বলে, একবাব এক বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা আমাকে দেখতে এসে আমার মাথার খোঁপা দেখে চুল খুলিয়ে চুল টেনে দেখেছিলেন, বোধ হয় পরীক্ষা করছিলেন পরচুল কি না।

কঙ্কন হো-হো করে হেসে উঠে বলে, খুব মজা তো ! আপনি কিছু বলেননি ?

—হ্যাঁ সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি, ভদ্র মহিলা অসম্ভব কালো পা দুটো আরো কালো। আমিও সাথে সাথে ওর পায়ের ফুলো ফুলো পাতা আঙ্গুল দিয়ে ঘষে আলোর কাছে আঙ্গুল নিয়ে দেখতে সুরু করতেই ভদ্র মহিলা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, এসব কি বেয়াদবি ! আমি বললাম, আপনার রঙের উপর এক পোচ কালি মাখানো আছে নাকি দেখলাম। ফলে ওরাও আমায় পছন্দ করলেন না, বাবাও ওদের পছন্দ করলেন না।

কথা শুনে কঙ্কনের অস্থির হাসিতে বাইরের মেয়েরাও হাসতে সুরু করলো।

ইতিমধ্যে ঝিয়ের হাতে জেঠাইমা চা আর খাবার পাঠিয়ে দেন। ঝুমুর ট্রের জিনিষগুলো একটা একটা করে নামিয়ে ওদের সামনে খাবার গুছিয়ে দেয়।

কঙ্কন মিষ্টির প্লেটটা তুলে ঝুমুরের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনি একটা তুলে নিন।

ঝুমুর একটু লজ্জিত হয়ে বলে, কিন্তু····

—কিন্তু নয়, নিশ্চয়ই নিতে হবে। ওর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা আবদারের সুর ফুটে ওঠে।

ঝুমুর কঙ্কনের প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নেয়।

সরোজ আর কঙ্কন চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে।

খাবার খেতে খেতে সরোজ আস্তে আস্তে বলে, তুই তো দেখি জমে গিয়েছিস, আজকের রাত কি এখানেই কাটাতে হবে না কি?

কঙ্কন ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার বাবার সাথে দেখা করে' এবার বিদায় নেবো।

ঝুমুর উঠে ওদের নমস্কার করে বলে, আমি গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঝুমুর বেরিয়ে যায়।

কঙ্কনও প্রতি-নমস্কার জানায়। জানিয়ে ঝুমুর চলে গেলে সরোজকে একটু ধমক দিয়ে বলে, তুই তো ভীষণ অভদ্র, একটা প্রতি-নমস্কারও জানালি নে!

—যা, যা, কালো তো নয়, যেন জিওল মাছের গ্যাজা!

—কেন এত কি কালো! রঙটা তো আমার মিষ্টি বলেই মনে-হলো।

ইতিমধ্যে মৈত্র মহাশয় এসে বলেন, বাবাজীদের বুঝি যাবার সময় হলো? —বেশ বাবা বেশ, বড় আনন্দ হলো!

—আপনার মেয়ে দেখে আমরাও খুব আনন্দ পেলাম ; বাবার চিঠিতে সবই আপনি জানতে পারবেন।

—সেই ভালো। পিতা মাতার মতামত অবশ্যই শিরোধার্য।

কঙ্কন আর সরোজ কথা বলতে বলতে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

দ্বিতলের অলিন্দে ভর দিয়ে পাড়া প্রতিবেশী সমবয়স্ক মেয়েরা বর দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে ঝুমুরও আছে। কঙ্কন উপরের দিকে তাকাতেই ঝুমুরের সাথে চোখাচোখি হয়ে যায়। ও হাত তুলে অভিবাদন জানাতেই ঝুমুর টুপ করে বসে পড়ে।

ঝুমুরের বন্ধু ঝুমুরকে চিমটি কেটে বলে, পোড়ারমুখীর বর তো নয়, বেহায়া !

ঝুমুয় প্রশ্ন করে, কই বর ?

ঐ যে তোকে হাত নেড়ে চলে যাবার ইসারা দিলে !

ঝুমুর ধমক দিয়ে বলে, দূর বোকা ! ও বর নয়—বরের ছোট ভাই।

মেয়েটি জিভ কেটে বলে, তাই বল।

ঝুমুব ঝুনুকে বলে, সেজদি, এই ধড়াচূড়গুলো খুলতে পারি ?

—ধড়াচূড় কি রে ?

—যে জিনিষগুলো দিয়ে বর ভোলাতে হয়।

—তবে বল পোড়ারমুখী বর তোর ভুলেছে !

—হ্যাঁ সেই কথাটাই ভাবছি, পথে যেতে যেতে নামটাই না ভুলে যায়।

বাড়ী ফিরতেই মা ওদের জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে, কেমন মেয়ে দেখে এলি ?

যার বিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর।

জননী সরোজের দিকে তাকিয়ে বলে, কিরে তোর কি মত ?

কি যেন বাপু, তোমরাই বা কেন আমার বিয়ের জন্য মেতে উঠেছ বুঝতে পারছি নে।

হ্যাঁরে মেয়ে দেখে তোরা অমন মন-মরা হয়ে গেলি কেন ?

সে সব শুনে কি করবে, কঙ্কন উত্তর করে।

—কি হয়েছে খুলেই বল না।

—দাদাটা যে এত অভদ্র, তা আমার জানা ছিল না, গিযে আসরের বরের মত বসল, একটা কথাও বললো না এমন কি একটা প্রতি-নমস্কারও না। ও ভাবলো, কথা বললে অথবা ভদ্রতা করলেই টোপর মাথায় নিতে হবে। এসব বিয়ের ব্যাপারে আমি নেই, শুধু আমার মতামতের কথা জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো, মেয়েটির সৎ পাত্রে পড়া উচিত ; ও যদি আমার বোন হতো, দাদার মত পাত্রে অমন লক্ষ্মী মেয়েকে আমি বিয়ে দিতাম না।

কথাগুলো শুনে সরোজ বলে, মা ও মেয়েটির কঙ্কনের সাথে বিয়ে হলে মানাবে ভাল।

মা নিজের মান নিজে রাখবার জন্য সেখান থেকে সরে পড়েন।

—দেখ দাদা, তোর মত যদি দায়িত্ব নেবার অধিকার আমার থাকতো, তবে সত্যি আমি বিয়ে করতাম।

বিয়ের ব্যাপারে ছেলের মত নিতে গেলে অবস্থা কি দাঁড়ায় অনাদি বাবু এ কথা উপলব্ধি করে' স্ত্রীকে বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেগুলোকে তুমিই বাড়িয়ে তুলেছো, নইলে আমার মতের উপর মত ফলায়।

কঙ্কনের জননীর মনটাও সেদিন উগ্র ছিল। তিনি প্রতিবাদ করে বলেন, ছেলেদের স্বাধীনতা যখন দিয়েছিলে তখনই ভেবে দেখা উচিত ছিল মেয়ে সম্বন্ধে ওরা মতামত প্রকাশ করবেই। যাবার সময় ওদের বলে দিলেই পারতে, দেখে আসতে পার, কিন্তু মতামত প্রকাশ করতে পারবে না। তোমার মত পিতার সন্তানদের এই রকম

স্বাধীনতা দেওয়াই উচিত ছিল। ছেলে অমত করছে এটাও আমারই দোষ !

—ষোল আনা দোষ তোমার, মায়ের দোষেই ছেলেরা কুশিক্ষা পায়, অবাধ্য হয়।

—আর বাপের গুণে ছেলেরা ভাল হয়, বাধ্য হয়, এই তো বলতে চাও! বেশ আমি কুশিক্ষা দিয়েছি, তুমি ওদের সুশিক্ষা দেওনি কেন ?

—শিক্ষা দেবার সময় পেলাম কোথায় ? তার আগেই তারা নাগালের বার। আগে যদি জানতাম বড় বউ অভাবে সংসারটা একেবারেই বয়ে যাবে, তবে ভাঙ্গা ভেলায় চড়ে সমুদ্র সাঁতরাবার চেষ্টা করতাম না। ছেলের মা হয়ে তোমার বড্ড তেজ হয়েছে !

কথায় কথায় কথা বাড়ে। স্বামীর দুর্ধর্ষ রাগের স্বরূপ মনীষার অবিদিত নয়। বড় বড় ছেলেদের সামনে মনীষা আর বাদপ্রতিবাদ না করে দুঃখে রাগে ক্ষোভে নিজের ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করেন।

দুই বৎসর পরের কথা। ধেনো এখন সায়েন্সের রিসার্চ ষ্টুডেন্ট। বৎসরের অধিকাংশ সময় ওকে কলকাতাতেই থাকতে হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র হিসাবে ওর খ্যাতি আছে। সাত দিনের ছুটিতে ও গ্রামে এসেছে। আজকাল ঝুমুরদের ওখানে ও যায় না। কিছু দিন আগে ঝুমুরের জেঠাইমা ঝুমুরের অসাক্ষাতে বলেছিলেন, বাবা, পাড়ার মানুষ তোমার আসাযাওয়া নিয়ে বড্ড কাণাঘুষা করে, তাছাড়া ঝুমুরের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে।

কথাগুলো ধেনোর আত্মসম্মানে তীব্র কশাঘাত করে। ও এ বাড়ীর মোহ কাটাবার জন্য গ্রামে আসা প্রায় বন্ধ করেই দেয়। শৈশবে পিতা মাতার প্রহার, আর যৌবনে ঝুমুরের জেঠাই-মায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত-পূর্ণ কথা ওর অবলুপ্ত অনুভূতিকে সচেতন করে তোলে। হঠাৎ ও গল্প-লেখক হয়ে দাঁড়ায় এবং ওর প্রথম লেখাটি বিশেষ

খ্যাতি লাভ করে। গ্রামে এসেই ধেনো গল্পটা ঝুমুরকে পাঠিয়ে দেয়। ঝুমুর অনেক রাত্রে গল্পটা পড়তে থাকে। গল্পটার নাম 'মহা যাত্রা'—লেখক ধ্যানেশ্বর পুরকায়স্থ। গল্পটা এই রকম ঃ

ছোট নাগপুরের একটা বিরাট পাহাড়ী অঞ্চলে রাহুল তার ল্যাবেরেটারী বসিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা হল ঘরে কাঁচের পার্টিশন দিয়ে ঘরগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাগ করা হয়েছে। বিরাট বিরাট কাঁচের আলমারী জগতের সমস্ত বিস্ময়-বস্তুর আধার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় একটা টেবিলে বড় বড় কাঁচের জার, তার ভেতর কত রকম জীবাণু, কত রকম নীল, লাল, সবুজ তরল পদার্থ! আর একটা ঘরে গ্যাসের কারবার, কোনটা বিষাক্ত, কোনটা জৈব গবেষণার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আর একটা ঘরে যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি। এক জায়গায় একটা বিরাট কাঁচের চৌবাচ্চায় জল বেঁধে রাখা হয়েছে। জলগুলো পচে শ্যাওলা ধরে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তাতেই প্রয়োজন। আর একটা ঘরে ফারনেসের মত কি জ্বলছে; তাতে কত কিছু গলানো হচ্ছে। হাতে কলমে যারা কাজ করছে তারা রাহুলের ছাত্র।

একটা টেবিলে কতগুলো পাথরের টুকরো নিয়ে রাহুল দেখে যাচ্ছে আর কাগজ কলমে কি যেন লিখছে। ওর পাশে বসে প্রাণা এ সবের কোন কিছুর অর্থ বোঝে না। সে বসে বসে হাই তোলে আর বলে, কি হচ্ছে রাহুল, বলতো, শুধু শুধু কি এমনি করে বসে থাকা যায়!

রাহুল ওর হাত দুটো ধরে বলে, আমার জন্য নয়, এ এক্সপেরিমেণ্টটা সফল হলে জগতের মঙ্গল হবে; আর পাঁচ মিনিট বসো; তুমি চলে গেলে আমার সব ভুল হয়ে যায়।

প্রাণা আবার হাই তুলতে থাকে। রাহুল এক্সপেরিমেণ্টটা শেষ করে বলে, তিন মাস ধরে চেষ্টা করে আজকে আমার প্রচেষ্টা সফল হল। মনে হচ্ছে বিশ্বের দরবারে আমার থিওরীটা এবার স্বীকৃত হবে।

প্রাণার মাথা তখন রীতিমত ধরে উঠেছে। এ ঘরটার ভেতর বাইরের বাতাস নিষিদ্ধ। প্রাণা ওর মাথার রগ দুটো টিপে ধরে বলে—এখন বাড়ী যাচ্ছি, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

রাহুল কতকগুলো ট্যাবলেট বার করে বলে, খেয়ে দেখ, ভোজ-বাজির মত তোমার মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। সে জোর করেই একটা ট্যাবলেট প্রাণাকে খাইয়ে দেয়।

রাহুল আজ পাঁচ বৎসর ছোট নাগপুরে আছে, দৌড়ে দৌড়ে প্রায়ই তাকে আমেরিকা, ফ্রান্স আর লণ্ডনে ছুটতে হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। অল্প বয়সে ও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। রাহুলের একটা অতিথি-নিবাস আছে। ছোট নাগপুরে এসে অনেক দেশী বিদেশী লোক ওর অতিথি-নিবাসে দুই এক দিনের জন্য অতিথি হয়ে পরে বাড়ী ঠিক করে' ওখানে দীর্ঘ দিনের থাকবার ব্যবস্থা করে নেন।

প্রাণাও অতিথি হয়ে ওর বাড়ীতে উঠেছিল। যদিও সে আলাদা বাড়ী নিয়েছে একটা ছোট্ট পাহাড়ী টিলার উপর, তবু রাহুলের যন্ত্রণায় ওখানে থাকা ওর হয়ে ওঠে না। ওর কবি মনটা রাহুলের পাল্লায় পড়ে শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। একটা বড় গল্প-কবিতা ও ধরেছিল, তাব অর্ধেক হয়ে আছে। ছোট নাগপুরের মাটিতে পা দিয়ে আর এক কলমও লিখতে পারেনি। ওর বাড়ীটা রাহুলের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। ও যদি একটু বেশী সময় ওর নিজের বাড়ীতে থাকে, রাহুল একস্‌পেরিমেণ্ট ফেলে নিজেই এসে ওকে তাগিদ দিয়ে যায়। ও কাছে না থাকলে নাকি রাহুলের একস্‌পেরিমেণ্টে ভুল হয়ে যায়!

প্রাণা প্রসাধনটাও ভাল করে শেষ করতে পারে না। ও রাহুলের সাথে বেরিয়ে পড়ে। প্রাণা মাঝে মাঝে ভাবে। অদ্ভুত জীব তো এই রাহুল! লোকটার মেয়ে মানুষের উপর আসক্তি নেই, কিন্তু মেয়ে মানুষ পাশে না থাকলে সব ভুল হয়ে যায়! প্রাণাও কম মুখরা নয়;

কিন্তু মুখ নাড়া দেবার সুযোগ সময় সে একদিনও পায়নি। রাহুল এমনি কর্মব্যস্ত।

আজ সাতদিন ধরে পাহাড়ী বৃষ্টি নেমেছে, কিছুতেই থামছে না। প্রাণার টিলার ওপরের ছোট বাড়ীটা ধ্বসে পড়লো না ডুবে গেল, ও তার কিছুই খবর রাখে না। রাহুল একের পর একটা একসপেরিমেণ্ট করে যাচ্ছে ওকে পাশে বসিয়ে। অনেক দিন এমনও হয়, অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটারীর বিশ্রাম ঘরেও ও ঢুকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত চাকর রাহুলের টেবিলের কাছে একটা ভাজ করা ছোট খাট পেতে বালিস দিয়ে যায়। প্রাণা উপায়ান্তর না দেখে মডেল হয়ে বসে থাকায় ক্লান্তি-আচ্ছন্ন দেহটাকে নিয়ে ভাজ করা খাটের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাহুল কিন্তু দেখেও দেখে না। ঘুমিয়ে আছে কি জেগে আছে, তা দিয়ে ওর দরকার নেই। প্রাণা ওর পাশে আছে, এইটেই ওর পক্ষে যথেষ্ট।

সেদিন আর একটা নূতন ঘরে ও কাজ করছে। একটা কাঁচের 'জারে' কতগুলো বড়-বড় পোকা গায়ে গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে খেলে বেরাচ্ছে। প্রাণা ঘুমাচ্ছে। অনেক রাত্রেই ও এমনি করে ঘুমিয়েছে, আজকে নূতন নয়। রাহুল তখনও এক মনে কাজ করছে। ওর টেবিলে এক কাপ কফি। বৃষ্টি তখনও হু-হু করে ঝরছে পাহাড়ী বাতাসের সাথে সাথে।

পোকাগুলোর চলাফেরা আজ ওর কাছে নূতন বলে মনে হয়। ওদের সমস্ত কাহিনী রাহুল নোট করতে থাকে। রাত্রি তখন দেড়টা।

হঠাৎ রাহুল প্রাণার দিকে একবার তাকায়। ওর ব্লু রঙের ব্লাউজের প্রথম তিনটে বোতাম খুলে যাওয়ায় প্রাণার শুভ্র বক্ষের খানিকটা বেরিয়ে গেছে। ওর পাইপিং পায়ের মটকা শাড়ীর গেরুয়া আভা ওর দেহের রঙের সাথে মিলে একটা বর্ণ-আসক্তি রাহুলের

দেহনাভূতির চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে। রাহুল ওর কলমটাকে একপাশে রেখে ভাবতে থাকে, প্রাণার এখানে থাকবার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ও পদ্মা পাড়ের মেয়ে, ওর ঘর বাড়ী মা, বাবা, চারটি ভাইবোন, রাক্ষুসী পদ্মা ভাঙ্গনের মুখে গ্রাস করেছে, পারেনি শুধু ওকে নিতে। প্রাণা বিচালি স্তূপের উপর ভাসতে ভাসতে ওদের বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে একটা গ্রামে সংগাহীন অবস্থায় উঠেছিল কতগুলো বিড়াল কুকুরের সাথে। সেই থেকে খড় দেওয়া ছোট বোটে বাসা বেঁধে জীবন কাটাচ্ছে। ও বিধবা না সধবা অথবা কুমারী রাহুল আজও তা জানে না। কবি ও সুন্দরী প্রাণার সুষ্ঠু দেহ-ভঙ্গি রাহুলের ভাল লাগে। ও নিজেও বুঝতে পারে না, ও প্রাণার দেহ-পিপাসী কি না। আর বুঝে দেখবেই বা কখন! এত ভাববার সময় কোথায়!

বৃষ্টি পড়াব শব্দ, পোকাগুলির ঘন আবেষ্টন, প্রাণার অসম্বৃত অবস্থা, সব কিছু মিলিয়ে রাহুলের প্রাণে দেখা দেয় গভীর বুভুক্ষা। ও উঠে প্রাণার অর্ধ নগ্ন বক্ষে মাথাটা রাখতেই ওর শিরায় শিরায় কামনার বেদনা খেলে যায়। প্রাণা কিন্তু ঘুমিয়ে থাকে পরম নিশ্চিন্তে। রাহুলকে ও পুরুষ বলে বিশ্বাস করে না। প্রায় রাত্রেই ও এমনি ভাবেই ঘুমিয়ে থাকে।

রাহুল ওর গণ্ডে নিস্তব্ধ আবেদন এঁকে দেয়। প্রাণা তবুও নিদ্রা-চ্ছন্ন। রাহুল এইবার মাতালের মত আত্ম-বিস্মৃত হয়ে প্রাণাকে গভীর আলিঙ্গনে বাঁধতেই প্রাণা ধড়ফড় করে উঠে বসে এবং অবস্থাটাকে উপলব্ধি করেই প্রচণ্ড একটা চড় মারে। চড়টা রাহুলের গায়ে না লেগে একটা জলের জারে লেগে জারটা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে। রাহুলের লেখা নূতন থিসিসটা জলে ভিজে কালি থেবড়ে যায়। প্রাণা ছুটে গিয়ে ব্লট করে সেটাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।

চড়টা রাহুলের গালে না লাগলেও মনে লাগে প্রচণ্ড বেগে।

বৈজ্ঞানিক রাহুল ততক্ষণ কাঁদতে থাকে তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল গিয়ে। বৃষ্টি তখন আরো জোরে ঝরছে। প্রাণা একবার বাইরের দিকে তাকায়। না, কোন ক্রমেই তার বাড়ী ফেরবার উপায় নেই! পাহাড়ী রাস্তা এত-বৃষ্টিতে রীতিমত পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে; তাতে আবার গহীন অন্ধকার। রাহুল তখন কাঁদছে। এটা ওর ভ্রষ্ট জীবনের অনুশোচনার কান্না।

প্রাণার মনটা একটু নরম হয়ে আসে। কত রাত তো ও এমনি করেই ঘুমিয়েছে, কখনো তো রাহুল এমন করেনি! ও চিরদিনই রাহুলের মুখে একটি কথাই শুনে এসেছে, জগতের মঙ্গলের জন্য আর একটু বসো।

প্রাণা বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিশ্বের বুভুক্ষু আত্মার আবেদন শুনতে পায়। ওর কবি মনটা রাহুলকে ক্ষমা না করে পারে না। রাহুলের কান্না-ঝরা ভিজে হাত দুটো নিজের হাতে তুলে নিল প্রাণা। রাহুল বলে, ক্ষমা আমি চাই নে, আমায় শাস্তি দাও!

প্রাণা কলমি লতার মত হলদে আঙ্গুলগুলো রাহুলের ঘন রুক্ষ চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে—তোমার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট এখনো শেষ হয়নি, ওঠ, আমি বসে আছি, তুমি ওটাকে শেষ কর!

—না, আমি পারব না।

—তোমাকে পারতেই হবে, কেন না বিজ্ঞানকে আমার কাব্যের মতই আমি ভালবাসি।

আলমারি খুলে রাহুল মদের জার বার করতেই প্রাণা ওর হাত ধরে বলে, আপত্তি আমার নেই, সুরার একটা প্রাণ আছে, একথা আমিও বিশ্বাস করি। তোমার অনভ্যাসে এই গভীর বর্ষা রাত্রে এতগুলো মদ যদি ঢক ঢক করে খাও, তবে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট তোমার আজ শেষ হবে না, ওটা আমার হাতে দাও।

রাহুল জারটা ওর হাতে দেয়—যেন প্রাণার অবাধ্য ও কোন দিন কোন কারণে হতে পারে না, এমনি একটা অসহায় ভাব নিয়ে।

প্রাণা রাহুলের হাতে কলমটা তুলে দেয়।

রাহুল আবার লিখতে থাকে। কিন্তু সব ভুল। ওর মুখ দেখে প্রাণা তা বুঝতে পারে।

প্রাণা উঠে ওকে দুধ ব্রাণ্ডি দেয়। রাহুল ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু খেয়ে নিয়ে আবার লিখতে থাকে।

কিন্তু তবুও ভুল।

প্রাণা হতাশ হয়ে পড়ে; রাহুলের চোখেমুখে ফুটে ওঠে ভিক্ষা! ওর চোখ দুটো শুধু বলতে থাকে, একটু, একটু দাও, আমার জন্যে নয়, জগতের মঙ্গলের জন্য।

প্রাণা উঠে ঘন সন্নিবেশিত পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। অদৃশ্য লোকের কারো কাছে প্রার্থনা জানায়, প্রভু সম্মত হবার মন আর আবেগ আমায় দাও বৃহৎ কাজে অবচেতন মনটাকে চেতনা দেবার জন্য!

প্রাণা আরও একটু নরম হতেই রাহুলের বহুদিনের মেধা-মিশ্রিত সংযম চরম রূপ ধারণ করতে চায়। প্রাণা ওকে চরমতা থেকে ঠেকিয়ে রাখে।

প্রাণা তখন ভাবতে থাকে ওর নিজের কথা। কত পুরুষই ওর জীবনে এসেছিল—সুন্দর, বিদ্বান, বিত্তশালী; কিন্তু কাউকেই ও গ্রহণ করতে পারেনি; কেননা ও জানতো ওর চিরদিনের যাযাবর মনটা কোন সাংসারিক আবহাওয়া সহ্য করতে পারবে না। তারপর ঘন ঘন সর্দি কাশিতে উৎপীড়িত হয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ মত ও এসেছিল একটু শুকনো আবহাওয়াতে। সে আজ দশ মাস আগের কথা। রাহুল ওকে এক মুহূর্তের জন্য কাছ ছাড়া করেনি। অদ্ভুত বটে! সত্য সত্য প্রাণার উপস্থিতি রাহুলকে বিশেষ কর্মক্ষম করে তোলে। এ সত্য প্রাণা মুখে না বললেও, মনে মনে উপলব্ধি করে।

রাহুল ওর দেহের চাইতে ওর কৃষ্টির প্রতি বিশেষ আসক্ত, একথা প্রাণা ভাল ভাবেই জানে। প্রাণা রাহুলের উদার মনটাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাহুলের জ্ঞান আর উদারতার কাছে ওর নারীত্বের গর্ব নুইয়ে আসে।

আজকাল রাহুল প্রাণাকে আরো ভালো করে পেতে চায়, এটা ও হাবেভাবে প্রথমে প্রকাশ করে; তারপর প্রকাশ্যেই রাত্রির জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করে। আজকাল প্রাণা সর্বতোভাবেই হার মেনেছে। রাহুল সমস্ত দিন পাগলের মত ল্যাবরেটারীর কাজ করে। আজকাল প্রাণা কিন্তু এতেও খুসী নয়, ও চায় রাহুল আরো বড় হোক, আরও মহৎ হোক।

তবু রাহুলের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বারে বারেই ভুল হতে থাকে। প্রাণা পাশে ব'সে, কাছে শুয়ে বিফল হচ্ছে; যে ভুল, সেই ভুলই থেকে যাচ্ছে। কিছুতেই কিছু না। হঠাৎ প্রাণা বায়না ধরে, আমি আমার পদ্মা পাড়ের ভিটেতে ফিরে যাব, কিছুতেই থাকবো না! এই যাযাবর জেদী মেয়েটার মন রাহুল জানে; তবুও অনেক চেষ্টা করে ওকে ধরে রাখবার জন্য কিন্তু প্রাণা বারে বারে একই কথা বলে, তোমার কাছে আমার থাকবার এখন আর কোন মানে হয় না, কেননা আমার উদ্দীপনার জীবন এখন ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন থাকতে হলে যে জীবনকে, যে মনোবৃত্তিকে মেনে নিতে হবে সেটা শুধু দেশাচার অথবা লোকাচার; বড় সাধারণ মনে হবে তোমার আমার ভালবাসাকে।

বৈজ্ঞানিক রাহুল ওর কথাগুলো কিছুক্ষণ চিন্তা করে ওকে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়। রাহুল জানতো 'দুঃখ পাব' একথা শুনলে প্রাণা যাবে না; কিন্তু ওর মনেও ঐ একই কথা জাগে। ও প্রাণাকে খুব সহজ ভাবেই বিদায় দেয়।

প্রাণা চলে যাবার পর তার দশ মাস অবস্থিতির স্মৃতিগুলি কিছু দিনের মধ্যেই বড় মধুর হয়ে ভাসতে থাকে; করুণ হলেও সে

চিন্তার মধ্যে একটা বেদনামিশ্রিত নুতন উদ্দীপনা আছে। রাহুল আবার লিখতে বসে।

ঝুমুর গল্পটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কি যেন একটা আবেশের অনুভূতি ওর সর্বাঙ্গে শির শির করে বয়ে যায়—ঝুমুর বুঝেও বুঝতে পারে না। ওর তুলির মত নিটোল আঙ্গুলগুলো কারো গভীর রুক্ষ চুলের স্পর্শানুভূতির কামনা জানায়।

ওর যুগল ভ্রূর নীচের কালো চারু চক্ষু দুটির ঘন পল্লব বারে বারে নেচে ওঠে। শূন্য ঘরে ঝুমুর লজ্জানত হয়ে ওঠে অশরীরি কোন প্রেমাস্পদের আবির্ভাব-সম্ভাবনায়।

ধেনো সেই ছোট্ট লিকলিকে, নোংরা জামা-প্যান্ট-পরা ধেনো, স্বাস্থ্য-সম্পদ-যৌবন-বৈবভে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত হয়ে গল্পের ভেতর দিয়ে তার রক্তিম কামনাকে দূতরূপে পাঠিয়েছে—ঝুমুর তা বুঝতে পারে। প্রভাতের দিকে তার সমস্ত মনটাকে সংযত করে সে একটা পাঠহীন পত্র লিখে বসে :

'ও পাড়ার মেয়ে মেঘার হাতের লাল পলাটা পাড়ার লোককে বুঝিয়ে দিয়েছিল—ওরে ঐ দুরন্ত মেয়েটার পাশে কেউ যাসনি! আর এ পাড়ার মনুয়ার কোমরের ধুসনি বাঁধা লাল সুতোটার মধ্যে ওর জননীর অব্যক্ত নিবেদন ছিল—ওরে আমার ছেলেটার ওপর নজর দিসনি! হঠাৎ একদিন একটা ফাল্গুনী রাত্রে মেঘার আঙ্গুলের টকটকে লাল পলাটা আপনা থেকেই খুলে পড়ে গেল। একটা বাধ্যতা মূলক মনোভাবকে সে সহজেই মেনে নিতে শিখে হলো নারী। আর মনুয়ার কোমরের ধুসনি বাঁধা লাল সুতো ভয়ঙ্কর আঁটসাঁট হয়ে উঠলো। ও নিজের পানে বিশ্বের রক্তিম দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবার কামনায় নিজের হাতেই কোমরের লাল সুতোকে কেটে দিলো চৈত্রের বিদায় পাণ্ডুর রাত্রে।'

মহুয়া চাইল মেঘাকে নিয়ে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের বাইরে এমন একটা দেশে বাস করতে, যেখানে জাত-জন্মের বালাই নেই, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন নেই; ধর্মাধর্মের বিচার নেই, অথচ ঠিক যাযাবরও নয়। এমন একটা দেশ যেখানে সম্পর্ক নেই কারো সাথে ঘন থকথকে আঁটালি মাটির মত লেপটে।

মেঘা কিন্তু সভ্যতা আর কৃষ্টির স্পর্শই বেশী ভালবাসে। ও চাইলো ওর বহুচারিণী মনটাকে একের মধ্যে বেঁধে রাখতে। জলের আঁচরের মধ্যে সে নিজের জীবনটাকে ছেড়ে দিতে চাইলো না। এতে দুজনের দ্বন্দ্বই বেড়ে গেল, সমস্যার কোন সমাধান হলো না। মহুয়ার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন জেগে উঠলো। এই উচ্ছৃঙ্খল হবার নেশাকে ওরা পুরুষাকার বলে মনে করে। মেঘা মহুয়াকে মিনতি করে লেখে, তোমার পাশে পাশেই আমি ফিরছি, তোমাকে বৃহৎ করবার জন্য, তাই মাটির মন্দিরে তোমাকে বরণ করা সম্ভব হলো না।'

ঝুমুর লেখাটা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ওর বইয়েব ভেতর ঢুকিয়ে দিলো। যথা সময় ধেনোর ছোট ভাই এসে বইটা নিয়ে গেলো। লেখাটি ধেনো পেয়েছিল এবং যত্ন করে তুলেও রেখেছিল।

এক বৎসর পরের কথা। ডাক্তার হরিনারায়ণের প্রবীণতার প্রাচীরে আগাছার আঁকর দেখা দেয়। ঝুমুরের বিয়ের ভাবনা বৃদ্ধের মাথায় একটা দুর্বহ চিন্তা হ'য়ে দাঁড়ায়। রক্তের ক্ষীণ সজীবতার সাথে সাথে মনের বলিষ্ঠ ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে হরিনারায়ণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। এদিকে ঝুমুরের সমবয়সী গ্রামের মেয়েরা প্রত্যেকেই একটি দুইটি সন্তানের জননী। ঝুমুরের অনূঢ় অবস্থা গ্রামের অনেকেই কুট চক্ষে দেখেন। মাঝে মাঝে নোংরা প্রস্তাব-পূর্ণ বেনামী পত্রও আসে ঝুমুরের কাছে। বেপাড়ার ছেলেরা

ডাক্তার বাবুর বাড়ীর সামনে এসে ঘন ঘন বাইকের বেল বাজায়, খোলা মাঠের অভাব না থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার বাবুর বাড়ীর সামনে বাঁধানো বকুল তলায় বসে বেকারের দল আড্ডা জমিয়ে তোলে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁরে ধেনো শেষে গ্রামটাই ছেড়ে দিলে!

ভাগ্য বিপর্যয়ে যথা মুহূর্তে আবার দেখা দেন অনুকূল সান্যালের ভাইপোটি। একটি মহা দুর্বল মুহূর্তে হরিনারায়ণ বিভূতিকেই পাত্র নির্বাচন করেন। সাথে সাথে শুভদিন নির্বাচনের জন্য ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পাঁজি কুষ্টি ঠিকুজির গোষ্ঠী জড়ো হয় হরিনারায়ণের অন্তঃপুরের উঠানে। অন্তঃপুরে জেঠাইমা ম্রিয়মাণ হন; ঝুমুর জননীর প্রস্তর প্রতিমূর্তির চরণ অশ্রুজলে সিক্ত করে।

অন্তঃপুরে কনের প্রসাধন নিয়ে আজ কোন মতান্তর নেই। আজ মাথার ফিতের থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লাল, সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার, সারা বাড়ীময় সরগরম, কিন্তু ঝুমুর ম্রিয়মাণ।

ঝুমুরের ন' বউদি ঝুমুরের মুখখানা তুলে ধরে বলে; "ও ননদি একটু হাস!

ওর মুখের অবস্থা দেখে ঝুমুর সত্যি হেসে ফেলে।

বন্ধুরা সব ওর গয়না দেখে ওকে ভাগ্যবতী বলে। ঈর্ষান্বিত প্রৌঢ়ারদল অসাক্ষাতে ঠোঁট উলটিয়ে বলে, ভাগ্য কি আর অলঙ্কারে, ভাগ্য হলো সিন্দুর শাখায়। তাদের মধ্যে এক জনের স্বামী চুরি করার অপরাধে তিন মাস জেল খেটেছে আর এক জনের স্বামী স্ত্রী লোক-ঘটিত কোন অপরাধে বুড়ো বয়সে বেপাড়ায় মার খেয়েছে বেশী দিন নয়—এই তো সেদিনের কথা! তবুও ওদের মুখেই গ্রামের উত্থানপতন নির্ভর করে।

. তারপর অন্তরের কোন বিধি না মেনে বিধিমতই ঝুমুরের বিয়ে হয় মহাসমারোহে। মালা-বদল, শুভ দৃষ্টি ইত্যাদি অনুষ্ঠানিক

ব্যাপারগুলো সুসম্পন্ন হয় গ্রামের পাঁচ জন মাতব্বরের সামনে।

পরের দিন ঝুমুরকে আশৈশবের ক্রীড়াভূমি কুসুমপুর ছেড়ে যেতে হবে। সানাইএর সুর মানুষের মনের সাথে সাথে অন্য সুর ধরেছে। গতকালের আমন্ত্রণের পাট আজও মেটেনি, সোরগোল প্রায় সমানই আছে; কিন্তু হরিনারায়ণের হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত, মাতৃহীন ঝুমুরকে বিদায় দিতে তাঁর কঠিন অন্তরও কেঁদে ওঠে।

বিদায়ের এক ঘণ্টা আগে ধেনো এসে উপস্থিত; ও এসে দেখে ফাঁকা ঘরে মাদুরে মুখ গুঁজে ঝুমুর নিশ্চল পাথরের মত শুয়ে আছে ধেনো একবার ডাকে, মৌমাছি! ধেনো আবার ডাকে, মৌমাছি! ঝুমুরের দুঃস্বপ্ন মুহূর্তের জন্য অপসারিত হয়, সে এক বুক আশ্বাস নিয়ে নিয়ে উত্তর দেয় কে, ধেনো! ধেনো লঙ্কা!

—হ্যা লঙ্কাই বটে—যার বিষের জ্বালা কারো পেলব জিভে সয় না। তোমার মত বাদলা দিনে বকুল তলায় দাঁড়িয়ে কব্জির জোর দেখিয়ে কাজের বেলায় ন্যুব্জ হয়ে পড়িনে। এমন করে জীবনটা বিসজন দেবার আগে একবার বিদ্রোহী হলে না কেন? এমন একটা আদর্শ হীন পুরুষের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলে, যার জীবনে অর্থলোভ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। আমি জানি আজকের দিনের এসব কথা তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ নাও লাগতে পাবে; কিন্তু আমি তোমার স্বভাবকে জানি, তাই বলছি পোষমানা বেড়ালের মত প্রভুর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতে তুমি পারবে কি? শেষ পর্যন্ত তোমার সমস্ত জীবনটাই পাঁচজনের মুখের টিকাটিপ্পনীর বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়! বিয়ের দিন এসে পৌছান সম্ভব হলো না, এসে দেখি প্রতিমা ভাসান দিয়ে ঢাকীরা ঢাক বাজিয়ে ফিরে আসছে। কোনদিন তোমার মত দুর্বল মেয়ের সাথে খেলা করে তোমারই শৈশব আদর্শের থেকে নিজের জীবনের খানিকটা গড়ে তুলেছি, এ কথা ভাবতেও লজ্জা হয়!

ধেনোর গর্ব্বিত যৌবন তখন পৌরষের আভিজাত্যে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে, আর ঝুমুর সে রূপের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ধেনো তার সবল হাত খানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নাও, ধর আমার হাত, এ হাত কোন কিছুর আশা না রেখে তোমাকে তোমার মানস লোকে পৌঁছে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে নির্ভয়ে এ হাত খানা ধরতে পার!

—ক্ষমা কর, মৌমাছি তার মিথ্যে যাত্রার পথে কোন নিষ্পাপ শ্যামল সবুজ পত্রে তার লুব্ধ স্পর্শ রেখে যেতে চায় না।

ঝুমুরের কথা শুনে ধেনো কঠিন হয়ে উঠে; একটু সংযত হয়ে বলে, বেশ তবে এই নাও আমাব ঠিকানা, কোন দিন তোমাব কোন কাজে লাগলে সুখী হবো।

ধেনো যেমন হঠাৎ ঢুকেছিল, ঠিক তেমন হঠাৎ বেরিয়ে গেল।

আসন্ন সন্ধ্যায় ঝুমুর গুরুজনদেব পাদ বন্দনা করে আর মঙ্গল ঘট প্রণাম করে আশৈশবের ক্রীড়াভূমি কুসুমপুর ছেড়ে যায়। যাবায় সময় পিতাব চরণে রেখে যায় দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল। অর্ধেক রাস্তা অবধি সানাই তার শেষ সুরে তাকে বিদায় জানিয়ে যায়, গ্রামের যাবা কোন দিন ঘোমটা খুলে তাকায় নি, তারাও আজ ঝুমুরেব সাথে সাথে সদব বাস্তার বাঁকে এসে দাঁড়ায়।

ঘাটের বুকে নৌকো বাঁধা। ওদের গ্রাম থেকে রেলওয়ে ষ্টেশন তিন মাইল—নৌকো করেই যেতে হয়। পথে যেতে যেতে ঝাঁকড়া বকুল গাছেব কাছে এসে ওর গতি একটু মন্থব হয়ে আসে। সেদিনের সেই গহীন বর্ষার কথা ওর মনে হয়। বিন্দী এখনো বেঁচে আছে ও ঝুমুরের বিয়েতে প্রথম এয়োর কাজ করেছে। বিন্দীর বোবা স্বামী এখনো বেঁচে আছে, বিন্দীর তাই সিন্দুর শাঁখায় সৌভাগ্যবতী। বিন্দীও বিধিমত বিবাহিতা এয়োস্ত্রী ওর বহু পরকীয়া প্রেম থাকা সত্ত্বেও।

এত দানের জিনিস এক নৌকোতে আঁটবে না, তাই বড় বড় দুটো নৌকো করা হয়েছে। ঝুমুরের নৌকো ফুলের সাজে ময়ুর পঙ্খী হয়েছে। একটা একটা করে মাল তুলতেও অনেক সময় লাগে। ঝুমুর ঘাটের পারে দাঁড়িয়ে। সে অবগুণ্ঠন একটু সরিয়ে গ্রাম দেখতে থাকে। এইটাই কুসুমপুরের শেষ সীমা। এর পরের গ্রামটা নন্দী গ্রাম। ঝুমুর কতদিন ধেনোর সাথে নাইতে এসে কুসুমপুরের পারে ডুব দিয়ে নন্দী গ্রামের ঘাটে উঠেছে; মাঝে একবার মাত্র মাথা উজিয়ে দম নিয়েছে। ধেনো দমের জোরের পাল্লায় চিরকালই ওর কাছে হার মেনেছে। আজকেও ধেনো হার মেনেছে; কিন্তু সে হার মানার ভেতরে ধেনোর জয়ের গর্বই বেশী—একথা ঝুমুর বুঝতে পারে।

আট দশটি জোয়ান মাঝি বৈঠা ধরে ঝুমুর নৌকায় ওঠে। তার পায়ের অলক্তক রাগ কাদায় ছাপের ভেতর একটি লাল আভা রেখে যায়। বৈঠা আর হালের টানে নৌকোটা তীর থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। পারে দাঁড়িয়ে মেয়ে বউরা উলু দেয় আর শাঁখ বাজায়, ঝুমুর ঘাটের দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। পারের গাছ পালা, মেটে ঘরগুলো ক্রমশই ছোট হতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে একেবারেই মিলিয়ে যায়। ঝুমুর তখন মাঝিদেরই আপন বলে মনে করে। ওরা ওদের গাঁয়েরই মাঝি।

যথা সময় ঝুমুরকে পৌঁছে দিয়ে গ্রামের নৌকো গ্রামে ফিরে আসে। অতি প্রত্যূষে ডাক্তার হরিনারায়ণ ঘাটে এসে ডাকেন, নন্দ!

নন্দ মাঝির এ গ্রামে এখনো নাম আছে। অনেক দিনের বুড়ো; কিন্তু ঝড়বাদলে নৌকো পড়লে জোয়ানরা এখনো ওরই পরামর্শ মত কাজ করে। হরিনারায়ণের গলা শুনে নন্দ শশব্যস্ত হয়ে বাইরে আসে। ওর হুঁকোটাকে পেছনে ধরে ও সাড়া দেয়, আজ্ঞে কর্তা!

—ওরা ঠিক মত পৌঁচেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তা, ট্রেনের পাদানে পা দিয়ে দিদিমণি আমার পানে তাকিয়ে বড় কাঁদতে লাগলেন।

—দিদিমণি কাঁদতে লাগলো, কিছু বললে ?

—না, কিচ্ছু না, ভাল মন্দ কিচ্ছু না।

—আর আমার জামাই ?

—তেনার বড় বিরক্তি ভাব দেখলাম, তিনি দিদিমণিকে একটানে গাড়ীতে তুললেন।

—একটানে গাড়ীতে তুললেন! আর প্রশ্ন করে তিনি মাঝিদের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ না করে' ওদের পাওনা মিটিয়ে বাড়ীতে না ফিরে রুগী দেখতে যান। এই রুগী দেখাটা হরিনারায়ণের নেশা! গ্রামের মধ্যে হরিনারায়ণ পয়সা নেন না; কিন্তু গ্রামের বাইরে ওঁর প্রচুর হাঁক।

কাল রাত্রিটা ট্রেনেই কাটে। পরের দিন ঝুমুর শ্বশুরালয়ে আসে। বাড়ীটা ছোট ফ্লাট বাড়ী; দুখানি ঘর; একটি রান্না ঘর। বিয়ের উৎসবের জন্য পাশের খালি ফ্লাটটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে।' তাছাড়া বাড়ীর ছাদটা খুব বড়। বিভূতির চলাফেরার মধ্যে কেমন একটা দিগবিজয়ের ভাব ফুটে উঠেছে। ঝুমুরের বাবার দেওয়া হিরার আঙটি ও বারেবারেই এ আঙ্গুল থেকে খুলে ও আঙ্গুলে পরছে। জায়গা অভাবে বিয়ের নূতন ফার্ণিচারগুলো খোলা বারান্দার একপাশে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। বিভূতি এক সপ্তাহের ভেতর ওগুলো বিক্রি করে দেবে—ওর দিদিমার কাছে এই রকম অভিমত প্রকাশ করতেই, দিদিমা অত্যন্ত অবাক হয়ে বলেন :

—দানের জিনিস কি বিক্রি করতে আছে! তোর যত সৃষ্টি-ছাড়া কথা! আমার সামনে বলছিস বল, বৌমার সামনে এমন কথা

বলিসনি ! জায়গা নেই জেনেও পরের পয়সা অকারণে কেন খরচ করালি ?

কি করবো বল, তিন মাস ধরে তুমি একটি পয়সাও দিচ্ছ না, ফার্ণিচারগুলো বিক্রি করে আর আজকের আশীর্বাদী টাকাগুলো মিলিয়ে তিন মাসের বাকি দেনা শোধ করবো, ভাবছি ।

আশীর্বাদী টাকার আশা করেই কি তুই এত লোক নেমতন্ন করেছিস ? কিন্তু এত আত্মীয় কুটুম্ব তিন দিন ভরে বসে খাওয়াতে আমার কত খরচ হলো, জানিস ?

—সেটা তোমার দোষ, আমি তো ভেবেছিলাম এক কাপ কফি খাইয়েই বিদায় করবো। তুমিই তো খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গাম করলে, এখন দেখছি পাওনার চাইতে দেনা বেশী হয়ে গেল ।

অদূরে বহুজনের পদধ্বনিতে এদের কথাপ্রসঙ্গ চাপা পড়ে। দিদিমা ছাদে যান রান্নাবান্নার তদারক করতে ।

বিভূতির দিদিমা, জোড়াসাঁকোর চাটার্জী পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। বাল বিধবা—বিপুল সম্পত্তির মালিক। নিঃসন্তান বিধবা বিভূতির জননীকে অতি শৈশব থেকে প্রতিপালন করে' সন্তান স্নেহের মধুর আসক্তিতে খানিকটা আবদ্ধ ছিলেন। সম্পর্কে ইনি বিভূতির জননীর মাতৃস্বসা। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে বিভূতিকে বিপাকে ফেলে আজ পাঁচ বৎসর বিভূতির জননীও নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। বিভূতির দিদিমা বিভূতিকে বিশেষ পছন্দ করেন না, একথা বিভূতিও জানে; কিন্তু তবুও বিভূতি আশা ছাড়ে না। মনে মনে ভাবে, তিনকুলে কেউ নেই আমি ছাড়া সম্পত্তি দেবেই বা কাকে ! বিভূতি স্বার্থের খাতিরেই দিদিমাকে সমীহ করে চলে। বিয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বিভূতি দিদিমার কাঁধেই চাপিয়ে দেয়। কিন্তু বন্ধু বান্ধব আর পাড়ার লোককে বলে, আমাকে এক পয়সা কেউ সাহায্য করেনি—নিজের পুরুষাকারে আমি উঠেছি ; আবার শূন্য ঘরে দিদিমাকে বলে, তুমি আমার জগদম্বা ! কিন্তু দারুন বুদ্ধিমতী দিদিমার কাছ থেকে বিভূতি আত্মগোপন করতে পারে না।

মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। ও যখন অকারণে মিথ্যে বলতে সুরু করে তখন সহ্য করতে না পেরে দিদিমা বলেন, দেখ বিভূতি তুই এখনো ছেলেমানুষ ; অনেকগুলো ইংরেজী কথা শুনে চ্যাটার্জী বাড়ীর বউ ভড়কে যায় না ; টাকা পয়সার দরকার হলে সোজাসুজি টাকা চাইবি, এত ভণ্ডামি করবিনে ! বিভূতি আত্মরক্ষার জন্যে আরো কতগুলো মিথ্যে বলে। দিদিমা সমস্ত বুঝেই ওকে ক্ষমা করেন।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। মেয়েরা সবাই মিলে ঝুমুরকে দিয়ে শুভ রাত্রির সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়ে জোর করে ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দোরটা ভেজিয়ে দেয়।

ঝুমুর গভীর ঘোমটায় মুখটা ঢেকে স্থির হয়ে দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিভূতি একটু অপ্রসন্নচিত্তে বলে, দেখ, 'এই ঘোমটা টোমটা সেকেলে জিনিসগুলো আমি মোটেই পছন্দ করি না। ও দেশের মেয়েদের স্মার্টনেস একটা সাধনাব জিনিস। ভাবতে পার—বল ড্যান্সের কথা ! বুকে বুক দিয়ে মুখে মুখ দিয়ে সেই অপরিসীম আনন্দ ! গভীর শীতে এক কোটেব নীচে ঢুকে সেই যে নিবিড় আশ্রয় নেবার ভঙ্গি, অনেকটা সেই ধরণের জীবন তোমাকে গড়ে তুলতে হবে।

ঝুমুর তবুও নীরব।

ও ধার থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বিভূতি উঠে এসে নব বধূব হাত ধরে জোরে টান দিতেই ঝুমুর হাতখানা আস্তে সরিয়ে নেয়।

বিভূতি তীব্র অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে বলে, তোমরা এত উগ্র কেন বলতো ও দেশের হনি-মূন-নাইট কি অদ্ভুত সুন্দর ! আর তোমরা যাকে বল এই শুভ রাত্রি, তার কোন অর্থই বোঝ না ! আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর ! বিভূতি বালিশের তলা থেকে কতকগুলো ছবি বার করে। তারপর এগিয়ে এসে ঝুমুরের হাতে ছবিগুলো দিয়ে বলে, এই

ছবিগুলো মাইনিউটলি লক্ষ্য করলে শুভ রাত্রির অর্থ তোমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ছবিগুলো দেখে ঝুমুরের মাথায় দাবানল জ্বলে ওঠে। ও শঙ্কা আর সরমহীন হয়ে সম্পূর্ণ গুণ্ঠন মুক্ত করে বলে,—আপনার শুভ রাত্রির দৃষ্টি ভঙ্গি আর আমার শুভ রাত্রির দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। ছবিগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে মেজেব ওপর ছড়িয়ে ফেলে বলে—এই কিছুক্ষণ আগে আপনি বল ড্যান্সের কথা বলছিলেন না? ইংরেজী আমি বিশেষ জানিনে, তবে বাংলা ভাষাব আমি অনেক বই পড়েছি। অনেক অনুবাদ কাহিনীও পড়ে দেখেছি, তাদের বল ড্যান্সের মধ্যে সংযম ও শিক্ষার চরম কিছু রয়েছে। নেহাৎ পল্লীবালা ভেবে আপনি আমার কাছে অর্থকে কদর্থ করছেন। আব তা ছাড়া ঐ উৎকট অসভ্য ছবিগুলো ভারতীয় শুভ রাত্রির অর্থ নয়, ভারতীয় শুভ রাত্রির নিগূঢ় অর্থ, শুভ বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে উভয়ের সম্মতিতে সমশয্যার, সমসুখের, সম বেদনাব প্রতিজ্ঞাকে বরণ করা। স্ত্রীলোকের চিত্ত জয় করতে প্রথম দিন যে স্ত্রী-চাতুর্য্যের, যে মাধুর্য্যের প্রয়োজন হয়, সে সাধনা আপনার জানা নেই। ক্ষমা করবেন, এ শুভ রাত্রির অনুষ্ঠান আমি মেনে নিতে পারবো না!

ঝুমুর দরজা খুলে ঘব থেকে বেরিয়ে আসে। বিভূতির দিদিমা ঘরের দরজায় আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ঝুমুর দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই ঠানদি ঝুমুরের হাত দুটো চেপে ধরে বলেন, কি হলো নাত-বউ, ঘর থেকে বেরিয়ে এলি! আত্মীয় কুটুম্ব বলবে কি! ঘরে যা।

ঝুমুর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

—ওমা ওকি লো নাতবউ, ঘরে যাঃ ঠানদি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকেন।

ঝুমুর আস্তে আস্তে বলে, ঘরে যাওয়াই কি সব চাইতে বড় কথা?

ও রে, পাঁচ জনের চোখে ছোট হতে নেই, লক্ষ্মী দিদি! আমার, আজকের কথা রাখ।

ঝুমুর একটু দাঁড়িয়ে থাকে তারপর কি যেন ভেবে আবার ঘরে ঢোকে।

বিভূতি আস্ফালন করে বলে ওঠে ফিরে আসতেই হবে, আমি জানতাম! খুব তো তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেলে, কিন্তু এখন বুঝেছ তোমার নিরুপায় অবস্থাকে?

ঝুমুর প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে, দমন করে রাখায় মধ্যে ক্ষোভ আছে, কিন্তু জয়ের ভিতরে আনন্দ আছে, এ কথাটা আপনি এখনও বুঝতে পারছেন না।

—হয়েছে ও সব বড় বড় কথা রাখো, আর কিছু জান না জান, ন্যাকামীটা খুব জান! ও সব গ্রাম্য গর্ব রেখে এখন শুতে এস। বিভূতি উঠে এসে সজোরে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ঝুমুরকে তবুও এক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিভূতি জোর করেই ঝুমুরকে বিছানায় টেনে আনবার চেষ্টা করে ঝুমুরও জোর করে চলে আসবার চেষ্টা করে। ঘরের ভেতর একটা অস্পষ্ট হুটোপাটির শব্দ আরম্ভ হয়।

বিভূতির দিদিমা বাইরে থেকে আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে ডাকেন, বিভূতি! বিভূতি!

বিভূতি একটু হক চকিয়ে নিজেকে সংযত করে ঝুমুরকে বলে, খবরদার দিদিমা যেন এসব কথা ঘুণাক্ষরেও না টের পান। বিভূতি দরজা খোলে।

ঝুমুর জড়সড় হয়ে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দিদিমা ঘরে ঢুকে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে বিভূতিকে বলেন, দেখ বিভূতি! অসভ্য রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েও সীতার ওপর বল প্রয়োগ করেন নি, সীতার সম্মতির অপেক্ষা করে-ছিলেন। আর নূতন বউ, যাকে নারায়ণ শীলা শালগ্রাম সাক্ষী করে এনেছিস, যার ওপর কোন জোর না খাটিয়ে সব জোর রাখবি, তার ওপরেই তুই আজ বল প্রয়োগ করতে চাইছিস! তুই আবার

নিজেকে সুসভ্য বলে সবার কাছে পরিচয় দিস। ছোট বেলা থেকেই তোর এই উৎকট বুদ্ধির জন্য নিঃসন্তান আমি তোকে সাহস করে আমার সম্পত্তি লিখে দিইনি, নইলে তোর টাকা আজ খায় কে!

—দিদিমা তুমি তো আমায় খুব বকছ, কিন্তু এই সীতা সাবিত্রীর মাটিতে এমন বেয়াদপ স্ত্রীলোক তুমি দেখেছ? শুভ রাত্রিটাই পণ্ড করে দিলে।

—কি বললি তুই! সীতা সাবিত্রীর কথা! সীতা কি তোর মত স্বামী পেয়েছিলেন—তিনি হর-ধনু ভঙ্গ করে স্বামী যাচাই করে বেছে নিয়েছিলেন আর সাবিত্রী সারা রাজত্ব ঘুরে সত্যবানের গলায় মালা দিয়েছিলেন, মাতাপিতার মতের বিরুদ্ধে। আমাদের এই ঘরোয়া জীবনের সাথে তুই করছিস তাঁদের তুলনা! দিদিমা ঝুমুরের হাত ধরে বলেন, নাত-বউ ঘণ্টা খানেক তুমি চুপ করে থাক, নিমন্ত্রিত আর কটি লোক খাইয়ে আমি এসে এর মীমাংসা করে দেবো। বাড়ী-ভর্ত্তি লোক-জন, তাঁরা দু ঘণ্টার জন্য এসেছেন, ভাববেন কি বলতো?

দিদিমা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যান।

ঝুমুর ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় কাঁদতে থাকে। বিভূতি উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলে—দেখ তোমাকে মারিনি, ধরিনি, কিছুই করিনি, এভাবে কেঁদে কেঁদে আমার প্রতি দিদিমার মনকে বিষিয়ে দিলে তোমার কিন্তু মঙ্গল হবে না, দিদিমার চোখে ভাল লাগাবার জন্যই, তোমায় আমার পাশে এসে বসতে হবে।

—আমি এইখানে এমনি করেই বসঁবো, আপনার যা ইচ্ছে করতে পারেন—ঝুমুর দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

—বটে গেঁয়ো ভূতের এত বড় স্পর্দ্ধা! বিভূতি ফুলদানিটা ছুঁড়ে মারতেই ঝুমুরের মাথায় না লেগে আয়নায় লেগে ঝন ঝন শব্দে কাঁচটা চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

শব্দ শুনে দিদিমা আবার ছুটে আসেন। অবস্থা দেখে তিনি

ঝুমুরের হাত ধরে বলেন, ভাগ্যিস সবাই চ'লে গেছে নইলে কি কেলেঙ্কারিটাই না হ'তো, চল নাতবউ আমার সাথে !

বিভূতি চিৎকার করে বলে— খবরদার না !

—নাত-বউকে আমার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি, তোর যা খুসী তা করতে পারিস ! তোর পাংশু মনের রক্ত আঁখিকে আমি ভয় পাইনে ! দিদিমা ঝুমুরের হাত ধরে তার মস্ত বড় গাড়ীতে ওঠেন। বিভূতি শূন্য ঘরে আস্ফালন করতে থাকে।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে ঝুমুর শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। মস্ত বড় বাড়ী, অন্দরে ঢুকতেই বিরাট উঠান, উঠানের এক পাশে শ্বেত পাথরের তুলসীমঞ্চ, চার পাশ দিয়ে ফুল গাছ, তিন কোণ করে কাটা সারিবদ্ধ ইটগুলোর গায়ে গায়ে অবস্থিতি ফুল গাছ-গুলোর পাশ দিয়ে একটা পরিখার সীমা টেনে দিয়েছে। চারপাশে শ্বেত পাথরের চেয়ারের মত বসবার জায়গাগুলো ঝক ঝক করছে। দোতলায় ওঠবার সিঁড়িগুলোতে ম্যাটিন পাতা,— ম্যাটিনের ওপর তিন পুরুষের পদরজঃ বর্ত্তমানের ধুলোর সাথে মিশে গিয়ে এ-যুগ ও-যুগের সাক্ষী হয়ে আছে। পরমায়ু এখনো শেষ হয়নি ; কিছু দিনের জীবন এখনো ওদের আছে। ঝুমুর সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে ওপরে উঠতে থাকে। বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে ভৃত্য পান্না আর বিষ্টু অনেক কাল ধরে এ বাড়ীতে কাজ করছে। দিদিমার কাজের জন্য— মোক্ষদা আর যশোদা। বাইরের ঘরে সরকার মশায় আর দরোয়ান— এদের নিয়েই দিদিমার নির্ঝঞ্ঝাট সংসার বেশ নিরাপদেই চলছে। ওরা বিশ্বাসী, তা ছাড়া দিদিমার জমিদারীর লোক। পাশের বাড়ীর মন্টু দিদিমার খুব প্রিয়। সে দিদিমার জরুরী চিঠিপত্র প্রায়ই লিখে দেয় আর পেস্কারীর পাওনা বাবদ দিদিমার কাছ থেকে অনেক কিছুই পেয়ে থাকে। ওর বাবা অদ্বৈত রায় দিদিমার এটর্নি।

দু'চার দিনের মধ্যে ঝুমুর মণ্টুর সাথে ভাব জমিয়ে নেয়। সেদিন সন্ধ্যায় ঝুমুর মণ্টুকে বলে—

—তুমি কোন ক্লাসে পড় ভাই ?

—ক্লাস এইটে,

—তোমার বাড়ীতে মাষ্টার মশায় আছেন ?

—আছেন ; আর আমার মাষ্টার মশায় কক্ষনো মারেন না। খুব ভাল মানুষ !

—তোমার বইগুলো আমায় একটু দেবে ?

—এখুনি এনে দিচ্ছি।

—না, না, এখুনি দরকার নেই, কাল আনলেই হবে।

ঝুমুর পরের দিন মণ্টুর বইগুলো দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাস এইটের বই আনিয়ে নেয়। চুপি চুপি মণ্টুকে বলে কাউকে বলোনা ভাই লক্ষ্মীটি, আর শোন, আমি যেগুলো লিখবো, তোমার মাষ্টার মশাইকে দিয়ে একটু সংশোধন করিয়ে দেবে।

—নিশ্চয়ই দেবো !

—আর একটা কথা, দিদিমার সামনে কিন্তু আমার পড়া-শোনার কথা কিছু বলবে না ! পুজোর ঘরের জানালা দিয়ে অনায়াসে হাত বাড়িয়ে জিনিসপত্র দেওয়া-নেওয়া যায়, খাতাগুলো দেখিয়ে রেখো ; পূজো শেষ হবার পর আমি ও ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করতে যাই, সেই ফাঁকে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খাতাগুলো আমায় দিয়ে দিও।

—কেন পড়াশুনো করলে দিদিমা বুঝি রাগ করবেন, মণ্টু প্রশ্ন করে।

না, উনি শুধু রামায়ণ, মহাভারত, মনসা-পুরাণ পড়তে বলেন ; স্কুলের লেখাপড়া উনি পছন্দ করেন না।

—ও বুঝেছি, বুড়ো মানুষ কিনা, তাই নূতন বউকে শুধু মহাভারত

রামায়ণ পড়াতে চান। মণ্টু আশ্বাস দিয়ে বলে, তোমার কিছু ভয় নেই বউদি, আমি সব ঠিক ক'রে দেবো।

কয়েক দিনেব মধ্যেই ঝুমুর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া শুনো আরম্ভ ক'রে দেয়।

মণ্টু একদিন চুপি চুপি বলে বৌদি, মাস্টার মশায় বলছিলেন তুমি সব বিষয় খুব ভাল জান; কিন্তু ইংরেজীতে একেবারে গবেট—ইংরেজী তোমায় খুব বেশী ক'রে পড়তে হবে।

ঝুমুর ঘার নেড়ে সম্মতি জানায়।

দিদিমার সাড়া পেয়ে মণ্টু তাড়াতাড়ি মহাভারত খুলে বসে।

সাত দিন পরের কথা। দিদিমা গঙ্গা নাইতে গিয়েছেন; বাইরের গেটে দারোয়ান, বিষ্টু আব পান্না কাজে ব্যস্ত; যশোদা আর মোক্ষদা দিদিমার সাথে গিয়েছে; উপবে ঝুমুর একা। দোতলায় নূতন পামসুর কচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনে ঝুমুব আশ্চর্য হ'য়ে ঘব থেকে বেরিয়ে এসে বিভূতিকে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে।

বিভূতি মুখটা বিকৃত করে বলে, ছোট ঘরের মেয়ের রাজরাণীর মত বেশ দিন কাটছে দেখছি! ডাক্তার হরিনারায়ণ মৈত্রকে চিঠি দিয়েছি, তিনি তোমার ব্যবহারের ইতিহাস শুনে তোমার মুখ দেখবার স্পৃহাও রাখেন না। বিয়ের রাত্রে পালিয়ে-যাওয়া কলঙ্কিনী মেয়ের জোড়ে না যাওয়ার কাহিনী ঢাকতে তাঁকে গ্রাম ছেড়ে তিন মাসের জন্য বাইরে যেতে হ'য়েছে—গ্রামের লোককে বলেছেন 'যাবার পথে মেয়ে জামাইকে নিয়ে যাব।' আহা কি মেয়ে, বুড়ো বাপের মুখে চুণ কালি মেখে দিলে!

ঝুমুর দরজার পাল্লা ধ'রে চুপ করে দাড়িয়ে থাকে শক্ত হ'য়ে।

—দুই একদিনের মধ্যেই কুসুমপুরে যাচ্ছি, তোমাদের গ্রামে গিয়ে ভেতরের খবর সব জেনে আসতে হবে। এর ভেতর নিশ্চয়ই কোন

রহস্য আছে, নইলে বিভূতি সান্যালের মত আপ-টু-ডেট, ইয়ংম্যানকে তুমি অবজ্ঞা কর কোন সাহসে

এবার ঝুমুর কথা না বলে থাকতে পারে না। ও বলে, হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কুমারী জীবনে যে মেয়ের স্বামী সম্বন্ধে কোন স্বপ্নই থাকে না, সেই নির্ব্বোধ মেয়েই আপনাকে স্বামী হিসাবে মেনে নেবে। আমার পবিত্র জীবনের পেছনে এমন একটা উদার চরিত্রের প্রতিচ্ছবি রয়েছে, যার আদর্শের কাছে আপনাকে বড়ই নিকৃষ্ট বলে মনে হয়। তাই মঙ্গলময় পরম ঈশ্বর আমার মিথ্যে শুভ রাত্রের ফুলশয্যা থেকে ছিনিয়ে এনে এক সর্ব্বত্যাগী বিধবার শয্যাপার্শ্বে আমার মধু-রাত্রির শয্যা রচনা করে আমাকে পরম অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন।

কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! বিভূতি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পাগলের মত ছুটে এসে ঝুমুরের চুলের ঝুঁটি চেপে ধরে। ঝুমুর কিন্তু একবারও ছাড়াবার চেষ্টা করে না। ঠিক সেই মুহূর্তে দিদিমাও উপরে এসে উপস্থিত। তাঁর সদ্যস্নাত শুভ্র মূর্তি এ দৃশ্য দেখে সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলে। দিদিমার পেছনে মোক্ষদা আর যশোদা, একজনের কাঁকালে গঙ্গাজলের ঘড়া আব একজনের হাতে ভিজে কাপড়। যশোদা আর মোক্ষদা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন,

ছেড়ে দে বলছি, নইলে দারোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করবো!

বিভূতি দিদিমার কণ্ঠস্বর শুনে হকচকিয়ে ঝুমুরের চুল ছেড়ে দেয়।

—নিরিবিলি বাড়ী পেয়ে কোথায় বউটার সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করবি, তা না করে উল্টে আরো মারধর করছিস!—

এ পরিস্থিতির জন্য বিভূতি প্রস্তুত ছিল না। উপায়ন্তর না দেখে কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে, শুভ রাত্রির ঘর থেকে তুমি আমার বউকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে, দিদিমা!

—মিথ্যে কথা ! কোনো "স্বামীর"-ঘর থেকে কোনো স্ত্রীকে আজ পর্যন্ত কেউ ছিনিয়ে আনতে পারেনি। পুরুষ নিজের স্ত্রীকে আয়ত্তে রাখে শাসন করেও নয়, তোষণ করেও নয়, রাখে নির্ভরতা আর মহানুভবতার স্পর্শে। তোর পশু-প্রকৃতি এ কথার অর্থ বোঝে না।

আমার বউ কিছুতেই আসতো না—তুমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছ !

বেশ তো, তাই যদি হয়, গায়ের জোর না দেখিয়ে, ভালবাসার জোর দেখিয়ে তুই ওকে তোর কাছে নিয়ে যা।

বিভূতি ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বলে, এখনো বল, তুমি আমার সাথে যাবে কিনা ?

ঝুমুর মুখ নীচু করে বলে—শুভ রাত্রির শয্যা থেকে যে স্ত্রী চলে আসে, আপনার পৌরষে আঘাত লাগে না বার বার তার কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে ! উদার মতবাদের ওপর আমাকে পরিত্যাগ করে যদি চলে যেতে পারতেন, হয়তো কোনদিন আপনার ওখানে ফিরে যেতে পারতাম ; কিন্তু এখন সেটা একেবারেই অসম্ভব।

বিভূতি দিদিমার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার বাড়ীতে আমি লাথি মারি—আমার বউকে আমি জোর করেই নিয়ে যাব।

দিদিমার আত্ম সম্মান বোধে তীব্র আঘাত লাগে। তিনিও জিদের ঝোঁকে বলেন—যতদিন ও ইচ্ছে করে না যাবে, ততদিন ওকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না, ও যদি এখানে থাকে ওর ব্যবস্থা আমিই করে যাব, গঙ্গা মৃত্তিকা হাতে নিয়ে আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম ! আর শোন বিভূতি, আমার বিনা অনুমতিতে তুই এ বাড়ীতে ঢুকতে পারবিনে !

বিভূতি তীব্র বেগে বেরিয়ে যায়।

এ বাড়ীতে ঝুমুরের সুনাম ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ঝুমুর প্রায় প্রতিদিনই অতি শুদ্ধাচারে দিদিমার রান্না করে। মাঝে মাঝে পাকা

চুল তুলে দেয়—দিদিমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনায়! দিদিমা ঝুমুরকে নিয়ে প্রায়ই পৌরাণিক নাটক অথবা সিনেমা দেখতে যান। তিনি সংস্কারপূর্ণ হ'লেও একেবারে ঘরোয়া জীবনের পক্ষপাতী নন। মাঝে মাঝে বলেন, বাছা মনের ওপর কি কারো জোর চলে, জোর করতে গেলেই আজকাল বিপত্তি। অল্প বয়সে একেবারেই একা পড়ে গেলে, মাঝে মাঝে তোমার জন্য ভাবনাও হয়। হ্যাঁ নাত-বউ তোমার বাবাও তো আচ্ছা মানুষ, একটা খবরওত নিলেন না!

বাবার কথা বললে ও চিরকালই দুঃখ পায়। মুখ নীচু করে ঝুমুর বলে, আমার বাবাতো কুসুমপুরে নেই। আমার কথা হয়ত কিছু শুনে আজ দু মাস হলো বৃন্দাবনে চলে গেছেন।

—তাইতো বাছা, ওঁরই কি দুঃখ কম! ওঁর হয়েছে চোরা কিল! কইবারও না, সইবারও না! কি দেখে যে তোমার বাবা বিয়ে দিলেন।

ঝুমুরের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। ও বলে, বাবার কি অপরাধ দিদিমা, সবই আমার অদৃষ্ট!

—যা বলেছ বাছা! এত ঘটা করে বাবা আমার বিয়ে দিলেন, সাধনা করেও বুঝি এমন স্বামী পাওয়া যায় না। আর শ্বাশুরীও ছিলেন তেমনি ভাল মানুষ। কিন্তু কপালে আমার কিছুই সইল না; পাঁচটা বছর না ঘুরতে কপাল পুড়লো। পোড়া রোগ কেউ সারাতে পারলো না। সেই শোকে শ্বাশুরীও শয্যা নিলেন। দু'বৎসর ভুগে ভুগে তাঁরও গঙ্গা লাভ হলো। শূন্য বাড়ীর তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালবার জন্য আমায় রেখে গেলেন। ভাবলাম বিভূতিকেই সব দিয়ে যাব; কিন্তু ওর হাতে পড়লে এ বাড়ীর মান মর্যাদা কিছুই থাকবে না।

যত দিন যায় দিদিমা, ততই চিন্তাশীল হয়ে ওঠেন। আজ কদিন হয় ওর কাছে ঘন ঘন এটর্ণি যাতায়াত করে। দিদিমা শীঘ্রই কিছু দিনের জন্য কাশী যাবেন, বাড়ীর ঝি চাকরেরা এই রকম বলাবলি ক'রতে থাকে।

দু' বৎসর পরের কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঝুমুর একাই

আছে। দিদিমা কিছু দিনের জন্য কাশী গিয়েছেন। ঝুমুরের প্রবেশিকা পরীক্ষা এসে গিয়েছে। পাশের বাড়ীর মণ্টুও বড় হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ঝুমুর মহা দুর্ভাবনায় পড়ে। দিদিমা যাবার পর থেকে এ বাড়ী থেকে এক পাও বেরুবার উপায় নেই। পরীক্ষা দেবে কি করে! প্রবীণা দাসী মোক্ষদার দৃষ্টি ঠিক শ্যেন দৃষ্টির মতই তীব্র। অনেক ভেবে চিন্তে ঝুমুর মণ্টুকে বলে, মণ্টু মোক্ষদাকে যদি বলি যে শিবরাত্রির উপবাসে তিন দিন ধন্না দেবার জন্য মণ্টুর সাথে তারকেশ্বর যাব তা হলে কেমন হয়?

—মণ্টু চোখ বড় বড় করে বলে, তা মন্দ নয়; কিন্তু ও যদি তোমার সাথে যেতে চায়?

—তুমিও পাগল! মোক্ষদা যাবে আমার সাথে! ও গেলে দিদিমার গয়নার সিন্দুক সামলাবে কে? ও হয়তো যশোদাকে আমার সাথে যেতে বলবে। এখন তুমি আমায় বলতো তিন দিনে পরীক্ষা শেষ হবে কিনা?

—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বউদি, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তিন দিনে কখনো শেষ হয়! কর গুণে গুণে মণ্টু বলে, কম করে সাত দিন। পরীক্ষা তো এসে গেল—তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল কি করবে না করবে। আর সব ঠিক হয়েছে। এডমিট্ কার্ডও পেয়েছ, এখন বাকী কাজটা ঠিক করে ফেল।

—এতদূর যখন এগিয়েছি—তখন কিছুতেই পিছুপা হবো না—আজ রাত্রেই একটা ব্যবস্থা ক'রবো। মণ্টু চলে যায়। যাবার আগে বলে যায়, সন্ধ্যে বেলায় আবার আসবো।

মণ্টু চলে যাবার পর, ঝুমুর অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে কি ভাবে। মোক্ষদা ঝাঁঝালো সুরে বলে—হাঁ গা বউমা, আজ বুঝি তোমার নাওয়া খাওয়া নেই?

ঝুমুর বিষণ্ণ মুখে বলে, কিছু ভাল লাগে না, মোক্ষদা মাসী!

মোক্ষদা অনুকম্পার সুরে বলে—কি করে ভাল লাগবে বল,

সোমত্ত বয়সে স্বামীর ঘর করতে পারলে না! তা বাছা মাতুলি টাতুলি একটা পর না?

ঝুমুর একটু উৎসাহ দেখিয়ে বলে, আচ্ছা মাসী বাবা তারকেশ্বরে ধন্না দিলে, খারাপ স্বামী ভাল হয়?

মোক্ষদা তারকেশ্বরের নাম শুনেই কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে বলে—, তা আর হয় না, তাঁর আশীর্বাদে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, অন্ধ দিব্য চক্ষে দেখতে পায়!

ঝুমুর মোক্ষদার হাত দুটো চেপে ধরে বলে, আমায় যেতে দেবে মাসী, একবার প্রভুর পায়ে ধন্না দিয়ে অদৃষ্টটাকে যদি একটু ফেরাতে পারি!

—তা বাছা শুভ কাজে বাধা দিতে নেই। তা ছাড়া আবার বাবার স্থান।

—কিন্তু দিদিমা শুনে যদি রাগ করেন, ঝুমুর ব্যাকুল হয়ে মোক্ষদাকে প্রশ্ন করে।

—সে আমি দিদিমাকে বুঝিয়ে বলবো, আর আমি বললে দিদিমা একটুও রাগ করবেন না, দিদিমা যতবার যান, সবই আমার হাতে ছেড়ে যান, টাকা বল, পয়সা বল, বিষয় বল, আসয় বল, সবই তো আমার হাতে, রাগ তিনি করবেন না। কিন্তু ভাবছি যাবে কার সাথে!

—কেন মণ্টুর সাথে! ওর মামাবাড়ী তারকেশ্বরে। দিনে ও দুবার যায় আর দুবার আসে। ও আমায় ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। আর মণ্টুর মাকে বললে, উনিও নিশ্চয়ই আমার সাথে যাবেন। আর থাকবার ভাবনাও ভাবতে হবে না। আট দশ দিন ওর মামার বাড়ীতে থাকলে ক্ষতি কি? ঝুমুর কথাগুলো বলে সম্মতির অপেক্ষায় মোক্ষদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্ষতি আর কি! মণ্টুর মামার বাড়ী ওদেশের নাম করা ঘর, আর তাদের বাড়ীর মেয়ে বউরা বে-আবরু নয়। এখন নেয়েধুয়ে ভাতের পাতে বসো। যাবার ব্যবস্থা আমি সব করে দেবো।

মোক্ষদা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে, স্বামীর জন্য মেয়েটার কত কষ্ট !

সন্ধ্যে বেলায় মণ্টু আর একবার আসে। ঝুমুর ওর কানে কানে বলে—মণ্টু তারকেশ্বর যাবার অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু তোমায় একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে।

কি মিথ্যে কথা ?

—মোক্ষদা যদি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করে, তুমি বলো, তোমার মা'ও আমার সাথে যাবেন, বুঝলে ?

—মিথ্যে কথা কেন, আমার পরীক্ষার আগের দিন মা সত্যি সত্যি তারকেশ্বরে যাবেন। ভাবছি, তুমি, আমি, আর মা, তোমাদের ঘরের গাড়ী করে এক সাথে বাড়ী থেকে বেরুব। কিন্তু তুমি তো আর সত্যি সত্যি তারকেশ্বরে যাবেনা। তুমি থাকবে কোথায় ?

—বাড়ীর গাড়ী আমায় হাওড়া পৌঁছে দেবে তুমি শুধু সাক্ষী গোপাল হয়ে আমার সাথে থেকো। তারপর যা করবার আমিই করবো।

যথা সময়ে ঝুমুর মোক্ষদার অনুমতি নিয়ে পরীক্ষার আগের দিন তারকেশ্বরের ট্রেনের সময় দেখে মণ্টু আর মণ্টুর মায়ের সাথে বাড়ীর গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। মোক্ষদা ঝুমুরের হাতে 'একশ' টাকার একটা নোট দিয়ে বলে—ট্রেন খরচা আর বাবার পূজা বাবদ এই টাকাটা খরচ করো। ঝুমুর নোটটা বুকের ভেতর পুরে নেয়। একটা চামড়ার সুটকেসে কয়েক খানা শাড়ী, জামা আর ছোট্ট একটা বেডিং নিয়ে ঝুমুর ওদের সাথে হাওড়া রওনা হয়। মোক্ষদা পুনঃ পুনঃ বলে, তাড়াতাড়ি ফিরে এস বউমা, পুণ্যি কাজে বাধা দিতে নেই তাই বাছা যেতে দিলাম।

ঝুমুর ঘাড় কাত করে মোক্ষদার কথায় সম্মতি জানায়। গাড়ীটা চলতে সুরু করে। মোক্ষদা আর যশোদা গাড়ীর দিকে শেষ বাঁক ঘোরা পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে।

ঝুমুর মণ্টুর মাকে প্রণাম করে বলে, মাসীমা মণ্টুর মুখে আপনি সব শুনেছেন নিশ্চয়ই ?

মণ্টুর মা খুব রাসভারী লোক নন ; বেশ হাসি খুসী। তিনি একটু হেসে বল্লেন, বাবা তারকেশ্বরকে একেবারে ফাঁকি দিও না, তোমার হয়ে পূজোটা আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু তুমি থাকবে কোথায় ?

—মেয়েদের কোন হোষ্টেলে।

মণ্টুর মা হেসে বলেন, মণ্টুর মুখে সব কথা শুনে আমি তো হেসেই অস্থির! ওকে বললাম, দেওর ভাজে তো খুব ফন্দি এঁটেছিস, মোক্ষদাও তোদের কাছে হার মানলো !

—কি করবো বলুন, বাবা তারকেশ্বরের নাম না করলে মোক্ষদা আমাকে বাড়ীর বাইরে পা বাড়াতে দিত না, পরীক্ষা তো পরের কথা ! মিথ্যের জন্য বাবা যেন আমায় ক্ষমা করেন !

—মিথ্যে হোক সত্যি হোক তুমি যখন ওঁর নাম করে বেরিয়েছ, তখন উনি তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন, মণ্টুর মা উত্তর করেন।

কথা বলতে বলতে গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভার ওদের পৌঁছে দিয়ে গাড়ী নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। যথা সময়ে মণ্টুর মা ওদের পুরোণো চাকর ভজহরির সাথে তারকেশ্বরের গাড়ীতে ওঠেন। ট্রেণ ছাড়বার আগে মণ্টুকে বারে বারে বলেন, তোর বউদিকে ভাল হোষ্টেলে দিয়ে যাস, আর যে ক'দিন থাকবে মাঝে মাঝে খোঁজ নিস।

টেণ ছেড়ে দিলে ঝুমুর আর মণ্টু বাইরে এসে একটা রিক্সা ভাড়া করে।

ঝুমুর বলে, মণ্টু তুমি রাস্তার বাঁ ধারটা দেখে যাও, যদি মেয়েদের হোষ্টেল বা ঐ জাতীয় কিছু দেখ রিক্সাটাকে থামিও। আমি ডান ধারটা দেখে যাই।

মিনিট পনেরো পরে ঝুমুর রিক্সাওয়ালাকে থামতে বলে। মণ্টুকে বলে, মণ্টু খুব শীগগির পেয়ে গিয়েছি ; ঐ দেখ বাড়ীটার সামনে লেখা আছে—"মহিলা নিবাস" "পুরুষের প্রবেশ নিষেধ", তুমি

একটু বসো আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি, ঝুমুর মণ্টুকে রিক্সার উপর বসিয়ে রেখে ভেতরে যায়।

বাড়ীটার ভেতরে ঢুকতেই একটা ছোট গলি—অন্ধকার ; তবে খুব অন্ধকার নয়। হঠাৎ আলো থেকে এসে গলিটাকে খুব অন্ধকার বলেই মনে হয়। তারই বাঁ ধারে এক তলায় একটা ঘর। দিনের বেলায় আলো জ্বলছে। ঘরটার বাইরে লেখা আছে "অফিস রুম"। ঝুমুর একটু সন্তর্পণে ঘরের ভেতর ঢোকে।

বর্ষীয়সী একটি বিধবা, চোখে নিকেলের চশমা নাক থেকে গলে গলে পড়ছে, তারই ফাঁক থেকে তাকিয়ে বলেন, কাকে চাই ?

ঝুমুর আস্তে আস্তে বলে—এখানে থাকবার জায়গা আছে কি ?

—আছে—ক'দিনের জন্য ? মহিলাটি প্রশ্ন করেন।

ঝুমুরের আড়ষ্ট ভাবটা তখন একটু কেটে এসেছে। ও বেশ সপ্রতিভ হয়ে উত্তর করে, এই দিন পনেরো, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই দেশে চলে যাব।

—তা বেশ তা বেশ, মহিলাটি খাতাপত্র খুলে বলেন—নাম ?

—ঝুমুর মৈত্র,

—পিতার নাম ?

—ডাঃ হরিনারায়ণ মৈত্র।

—বিবাহিতা ?

—আজ্ঞে না।

—উহুঁ সিঁথেয় সিন্দুর দেখছি ! মহিলাটি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে বলেন।

প্রশ্ন শুনে ঝুমুর একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ে। কিন্তু চিরদিনের মুখরা ঝুমুর হেরে যাবার পাত্র নয়। হঠাৎ হেসে উত্তর করে, বায়স্কোপের ছবি তুলে এলাম কিনা। একটা ছোট পার্ট ছিল, বাসর ঘরের এয়োর পার্ট—তাই সিঁথেয় একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে এয়ো সাজতে হয়েছে।

প্রবীণা মহিলাটি উৎসাহ ভরে বলে ওঠেন, তাই নাকি ! ছবিতে কাজ কর, কত টাকা পাও ?

ঝুমুর একশ টাকার নোটখানা বের করে বলে, এক ঘণ্টায় একশ টাকা।

—অ্যাঃ এক ঘণ্টায় একশ টাকা, বল কি বাছা ! তা তোমার চেহারাটা খাসা ! গানটান জান ?

—হা দু'চারখানা রেকর্ড করেছি—

—তা বেশ, তা বেশ, ওরে ও পদ্মিনী নূতন বোর্ডার এসেছে, ওকে ভেতরে নিয়ে যা—।

কালো ছিপছিপে বিধবা, অত্যধিক পরিশ্রমে চক্ষু কোটরাগত, আধ ময়লা জামা-কাপড় পরে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রবীণা মহিলাটি সোৎসাহে বলে ওঠেন—দেখ, দেখ পদ্মিনী কত গুণ ! সিনেমাতে পার্ট করে, রেকর্ডে গান গায়, আবার ম্যাট্রিক পরীক্ষাও দিতে এসেছে !

পদ্মিনী এক গাল হেসে উত্তর করে—এতদিন পরে গুণী বোর্ডার একজন এলো, কি বলো মাসীমা ? ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বলে—তা কতদিন থাকা হবে ?

এই দিন পনেরো—ঝুমুর উত্তর করে।

মাসীমা হেসে বলেন, সবাই পনেরো দিনের জন্যই এখানে আসে, কিন্তু এ জায়গার এমনি গুণ, পনেরো দিন পর এ জায়গা ছেড়ে কেউ যেতে চায় না।

মাসীমা আর পদ্মিনী নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই হাসতে থাকেন।

ঝুমুর বাইরে এসে মণ্টুকে বলে, সব ঠিক করেছি, আর তোমাকে আমার লোকাল গারজিয়ান করেছি। বোর্ডিংএর দারোয়ান ঝুমুরের বিছানাপত্র নিয়ে ভেতরে যায়।

ঝুমুর মণ্টুকে বলে—,তুমি একা বাড়ী যেতে পারবে তো ?

—বটে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আমায় অপমান করছ ?

ঝুমুর হেসে বলে মোক্ষদা মাসীকে একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখো ?

—এখনো তো আমি তারকেশ্বরের ট্রেনে রয়েছি, রাত্রি আটটায় বাড়ী যাব। কাল সকালে মোক্ষদার সাথে দেখা করবো তুমি কিছু ভেবো না।

—ঝুমুর হেসে ওকে বিদায় দেয়। রিক্সাটা ঠুন ঠুন করে সোজা চলতে থাকে।

ভোরে উঠে ঝুমুর লাল কালিতে দাগানো প্রশ্নগুলো একবার ভাল করে পড়ে নেয়। তারপর মাসীমার কাছে গিয়ে বলে বেথুন কলেজে আমার সিট পড়েছে, দয়া করে আমাকে সাড়ে নটায় সেখানে পৌছে দিতে পারে এমন কাউকে ঠিক করে দিতে পারেন।

মাসীমা মিশি দেওয়া দাঁত বের করে বলেন—,ও বাছা সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তিলকচাঁদের গাড়ী ভোর বেলা থেকে তোমার জন্য তৈরী হ'য়ে আছে, ওরে ও পদ্মিনী, আমাদের ঝুমুর রাণীর টিফিনের ব্যবস্থা ক'রে দে!

ঝুমুর তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করে বেছে বেছে একখানি ভাল শাড়ী পরে। বিয়েতে পাওয়া লেডিজ ঘড়িটা আজ ও প্রথম হাতে বাঁধে। তারপর মাসীমাকে প্রণাম করে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখে একটা বিরাট ঝকঝকে গাড়ী ওদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খোট্টা ড্রাইভার, তার সামনে 'গগলস' চোখে এক ভদ্রলোক বাঙ্গালীর মত ধুতি চাদর পরা।

মাসীমা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলেন—, ওঁর কথাই তোমার কাছে বলছিলাম ; ওঁর নাম তিলকচাঁদ, যেমনি উদার তেমনি অমায়িক আমাদের মহিলা নিবাসের প্রেসিডেণ্ট।

তিলকচাঁদ হাত তুলে নমস্কার করতেই ঝুমুরও প্রতি নমস্কার জানায়।

ঝুমুর ভেতরের সিটে বসতেই গাড়ীটা হর্ণ দিতে দিতে চলতে থাকে।

যথা সময়ে গাড়ীটা বেথুনে এসে দাঁড়ায়।

তিলকচাঁদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলেন, আমার গাড়ী ইধার থাকবে, আপনার জন্য টিফিন আনিবে।

আজ্ঞে না, অনেক ধন্যবাদ, খাবার আমি সঙ্গে এনেছি।

—এক দেড় বাজে আসিব মাষ্টারজিকে সাথে লিয়ে।

ঝুমুরের কথা বলবার সময় নেই। সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দলবাঁধা মেয়েদের পিছু পিছু পরীক্ষার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

প্রথম তিন দিনের পরীক্ষা ঝুমুর ভালই দেয়। চার দিনের দিন একটা পেপারের পরীক্ষা দিয়ে ঝুমুর তাড়াতাড়ি হোষ্টেলে ফিরে আসে। ঝুমুর ওর ছোট্ট চৌকির ওপরে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তেই পাশের ঘরের ফর্সা নাক-বোঁচা ঝাঁকড়াচুলো মেয়েটি এসে ঝুমুরের শান্তির ব্যাঘাত করে। মেয়েটি ঝুমুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে —তুমি তিলকচাঁদ বাবুকে চেনো?

—হ্যাঁ ঐ যে মারোয়াড়ী ভদ্রলোকটি, ঝুমুর ওর প্রশ্নের উত্তরে বলে।

—হ্যাঁ, ওকে তুমি পছন্দ কর?

—পছন্দ!

হাঁগো, এত আপ্যায়নের ঘটা দেখেও বুঝছ না?

আপ্যায়ন কি! মহিলা নিবাসে ঢুকেই আমার খাওয়া দাওয়া বাবদ নগদ পঁচিশ টাকা আগাম দিয়েছি, তাঁরা কি কেউ আমাকে দয়া ক'রেছেন নাকি?

পঁচিশ টাকা দিয়ে রোজ মিনার্ভায় চড়া যায় কি? আর ফিরপোর টিফিন? এসব আপ্যায়ন মাসীমা কি বিনা কারণেই করছেন নাকি?

—কি সব তুমি হেঁয়ালী কথা বলছ? ঝুমুর বিরক্ত হয়ে উত্তর করে।

হেঁয়ালী নয় গো দালালি? মেয়েটি টিটকারি করে বলে ওঠে।

কথাটা ঝুমুর দেবদাসে চন্দ্রমুখীর মুখে শুনেছিল। ও চমকে উঠে বলে দালালি?

—হ্যাঁগো, তিলক চাঁদ তোমাকে ভয়ঙ্কর পছন্দ করেছেন। আমাকে পেয়ে তিনি এই 'মহিলা নিবাসে'র বাড়ীটা পাঁচশ বৎসরের জন্য লীজ দিয়েছিলেন ঘর থেকে টিকিট খরচা দিয়ে। আর তোমাকে পেলে তিনি এই আট কাঠা জায়গা সমেত মহিলা নিবাসের বাড়ী, আর পাঁচ হাজার টাকা একেবারে দান ক'রে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এইবার বুঝতে পেরেছ কি?

—তোমাকে কি তিনি বিয়ে ক'রেছিলেন? ঝুমুর বোকার মত প্রশ্ন করে।

—বিয়ে! তোমার কি মাথা খারাপ হলো? বাংলার বুকে বসে ওরা ব্যবসা করে খায়—এটাও ওদের ব্যবসা। আমাদের দেশের চরিত্রহীন পুরুষ স্ত্রীকে গিল্টিকরা গয়না পরিয়ে, রক্ষিতাকে সোনা পরায়, আর ওদের দেশের চবিত্রহীন পুরুষ স্ত্রীকে সোনা পরিয়ে রক্ষিতাকে গিল্টিকরা গয়না পরায়! ওরা পাকা ব্যবসায়ী—ওরা মহা-পাপের মধ্যে পড়েও ফটকা বাজারকে ভুলে যায় না। যাকৃগে এসব কথা তুমি বুঝবে না। মঙ্গল যদি চাও তো পালাবার চেষ্টা কর।

—কিন্তু আমার যে এখনো হাইজিন পরীক্ষা শেষ হয় নি।

—রাখো তোমার হাইজিন পরীক্ষা, অন্য কোন ছাত্রী নিবাসে যাও।

দূরে পায়ের শব্দ শুনে মেয়েটি ঝুমুরের পায়ে একটা চিমটি কেটে পাশের ঘরে গিয়ে দু ঘরের মাঝের দরজার বাব এঁটে দেয়। ঝুমুরও একদম গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবার ভঙ্গি করে।

মাসীমা ঝুমুরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেও ডাকতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফাটা ফাটা চামড়া-ওঠা হাত দুটোতে তাড়াতাড়ি একটু তেল মেখে নিয়ে, ঝুমুরের থুতনি নেড়ে ডাকেন—ঝুমুর রাণী, ঝুমুর রাণী, ঝুমুর মিথ্যে ঘুম থেকে আড়িমুড়ি ভেঙ্গে বলে—কি মাসীমা!

মাসীমা মিষ্টি মধুর কণ্ঠে বলেন, ওঠ বাছা তিলক বাবু খাবার পাঠিয়েছেন।

খাবারের কথা শুনে ঝুমুর তাড়াতাড়ি উঠে বসে সত্যি ওর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

বাবা গো কত খাবার! ঝুমুর বিস্ময়ে বলে।

—হ্যাঁ বারো রকমের মিষ্টি, আট রকমের ফল, আর দেখেছ ঝকঝকে রূপোর পাত্রগুলো!

—ওর মনটাও অমনি ঝকঝকে না মাসীমা, ঝুমুর ব্যঙ্গ করে বলে!

—আহা বাছা, তা আর বলতে। মাসীমা খাবারগুলো নিরীক্ষণ করে ঢোক গেলেন।

ঝুমুর বেছে বেছে কয়েকটা খাবার তুলে নিয়ে বলে—মাসীমা আর খাবারগুলো কিছুটা আপনি নিয়ে অন্য সব বোর্ডারদের ভাগ করে দিন।

মাসীমা আনন্দে অধীর হয়ে চারটে পেস্তার বরফি এক সাথে মুখে দিয়ে বলেন, তুমি মা রাজরাণী, তুমি না দিলে পাব কোথায়?

আট দশটি বোর্ডার মিলে একটা একটা করে খাবারের পাত্র ধরে খাবার ঘরে নিয়ে যায়। ওদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে ভাল খাবারের বুভুক্ষা।

মাসীমা এক কাঁড়ি কিসমিস, পেস্তা মুখে দিয়ে বলেন—হ্যাঁ মা ঝুমুর, আজ একটা গান শোনাও না বাছা, ও সুহাসি, তোর এসরাজটা নিয়ে আয়, আমাদের বৈরাগী দিদি ভাল খঞ্জনী বাজায়, আর কুসুম তুই হারমোনিয়ামটা ধর!

ঝুমুর বলে, আজ থাক মাসীমা পরীক্ষা দিয়ে শরীরটা ভাল নেই।

—এতবড় আশা থেকে নিরাশ করতে নেই বাছা, একটি গাও!

ঝুমুর অপূর্ব্ব সুন্দর ভজন গান গায়। পাশের ঘরে তখন তিলক চাঁদ মস্তবড় সোফায় শুয়ে ঘাড় নেড়ে তাল দিতে থাকে।

গান শেষ হলে মাসীমা পাশের ঘরে গিয়ে বলেন, তিলক বাবু

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম, তুমি কাল মেট্রো যাবার ব্যবস্থা কর। আমি যাব আর উ যাবে।

মাসীমা আশ্বাস দিয়ে বলে, সব ঠিক করে দেব।

রাত্রি তখন নটা। তিলকচাঁদ বিদায় নিলে রাত্রে খাবারেব পাট সুরু হয়।

গভীর রাত্রে সেই নাক-বোঁচা ঝাঁকড়া-চুলো মেয়েটা ঝুমুরের পায়ে একটা চিমটি কেটে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। পা টিপে টিপে দু'জনে বাথরুমের দরজার উল্টো দিকের চাপা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। মেয়েটা বলে কেমন খেলে?

—ঝুমুর বলে পেস্তার বরফিগুলো বেশ লেগেছে, মহাপ্রাণের স্পর্শ পেলাম।

—কাল কি করছ; মেট্রো যাচ্ছ? তিলকের মৌতাতের মধু-মক্ষিকা হয়ে, মেয়েটি প্রশ্ন করে।

—হুঁ যাচ্ছি, মধু মক্ষিকা হয়ে নয় মহাজন হয়ে।

—বুঝেছি, কিন্তু পারবে তুমি?

—হুঁ, পারতেই হবে, কেন না শম্ভু নিশম্ভুকে বধ করতে শ্রীদুর্গাও সুন্দরী হয়ে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

—কিন্তু শম্ভু নিশম্ভু পাটের দালাল ছিলেন না, অথবা কালো বাজারের চোরা কারবারীও ছিলেন না। তাঁদের দেহে রাজ রক্ত ছিল। আর তিলকচাঁদের জাত পয়সা খরচ করে বোকা সাজতে চায় না। সহজে না পেলে মুখ বেঁধে নিয়ে যায়। তা ছাড়া চরিত্র

যাদের আছে, তারা জুয়া খেলতে চায় না, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাই বেশী।

—কিন্তু পালাবই বা কি করে, গেটে তো তালা দেওয়া।

—ঐ তো দেওয়ালের পেরেকে চাবি ঝুলছে, মেয়েটি বলে।

—ওমা কি বোকা অমনি করে চাবি রাখে যে কেউ তো পালিয়ে যেতে পারে ইচ্ছে করলে।

—পারে কিন্তু যায় না, তিলকচাঁদের মত ইদের চাঁদ, নদের চাঁদ অনেকেই এখানে আসেন কি না। আর তা ছাড়া, বিনে পয়সায়, শাক চচ্চরী দু'বেলা চা—একি আজকালকার বাজারে কম নাকি?

—বিনে পয়সা!

—কেউ এখানে পয়সা দিয়ে থাকে না। পয়সা পায় বলেই থাকে। ওর চোখ দু'টো ইস্পাতের ছুরির মত জ্বলতে থাকে।

ঝুমুর ওর হাত দুটো ধরে বলে, আজ রাতেই আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার!

কিন্তু এত রাত্রে যাবে কোথায় এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আর এক বিপদে গিয়ে না পড়।

—কেন রাস্তায় পুলিশ নেই?

পুলিশ! পুলিশ কি বিনা পয়সায় তোমার নালিশ শুনবে, ওরা পকেট ছাড়া কিছুই বোঝে না, একটু যারা উঁচুদরের, তারা হয়তো তোমার সুন্দর চেহারার কদর একটু আধটু বুঝে একআধ রাত্রি প্রাইভেট হাজতে রাখতে পারেন, তাও আবার আধ-খোরাকি। যেমন ধর তিলক চাঁদ তবু পয়সা দিতে চাইছে, পুলিশের লোক পয়সা দিতেও চায় না। ঐ যে পেতলের চাকতি, ওদের বিনা শুল্কে সর্ব্বজাতীয় বাণিজ্য করবার ট্রেড মার্ক। তাই চাইতে একটা কাজ কর, এখানে কোন চেনা লোকের বাড়ী আছে?

ঝুমুর মনে মনে একটু হাসে, কিন্তু একেবারে বোকা সেজে বলে—চেনা লোক! হ্যাঁ আছে, মতিশীল ষ্ট্রীট কোথায় বলতে পার?

—আরে এই তো মেট্রো সিনেমার পেছনে।

ঝুমুর হতাশ হয়ে বলে, কিন্তু আমি তো ভাই চিনিনে!

—আঃ তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না! তোমার বাক্সটা নিয়ে আমার সাথে সাথে পা টিপে টিপে এস, মেয়েটি দেওয়ালের পেরেক থেকে চাবিটা নিয়ে নেয়।

ঝুমুর প্রশ্ন করে, আমার বেডিং?

বেডিং-এর মায়া আপাততঃ বাদ দাও।

ঝুমুর অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঘর থেকে স্যুটকেশটা বার করে। ওরা খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনে গেটের সামনে আসে। নাক-বোঁচা মেয়েটি ক্ষিপ্র হাতে গেট খুলে ঝুমুরকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়; দূরে রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ শুনে মেয়েটি একটু এগিয়ে এসে হাত ইসারায় রিক্সা ডাকে। ঝুমুরের বুক তখন ঢিপ ঢিপ করে কাঁপছে।

রিক্সাটা কাছে এলে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, মেট্রো সিনেমাকা পিছুমে মতিশীল ষ্ট্রিট মে মাইকো ঠিক সে লে যাও—বকশিশ মিলেগা।

—রিক্সায় উঠে ঝুমুর বলে, তোমার নাম কি ভাই?

আমার নাম প্রমীলা বুঝেছ! রাবণের পুত্রবধূ রাঘবারি।

—অর্থ বুঝলাম না,

যদি কোনদিন সম্ভব হয়, এই রাম রাজত্বের মুখোশটা টেনে খুলে দেবো।

ঝুমুরের রিক্সা তখন ঠুন ঠুন শব্দে একটু গতিশীল হয়েছে। প্রমীলা জোর পায়ে বোর্ডিং-এর গেটে এসে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

কলকাতার রাস্তায় একা পথ চলা ঝুমুরের এই প্রথম। ভয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে উঠেছে, ও একমনে বিপদহারী মধুসূদনের নাম স্মরণ করতে থাকে।

কুড়ি পঁচিশ মিনিট চলবার পর, রিক্সাটার গতি একটু মন্থর হয়ে

আসে। জিজ্ঞেস করে—মাইজি ইযেতো মেট্রো সিনেমা, ইসকা পিছুমে যানে হোগা ?

ঝুমুর উত্তর করে হ্যাঁ !

রিক্সাটা বাঁক ঘুরে একটু চলতেই মতিশীল ষ্ট্রিটের রাস্তার নাম লেখা দেখে ঝুমুর রিক্সাওয়ালাকে বলে, রোক যাও !

রিক্সা থামতেই ঝুমুর রাস্তায় নেমে বাড়ীর নম্বর দেখতে সুরু করে। রাস্তার দুপাশে খুঁজে ... নম্বর মতিশীল ষ্ট্রিটের বাড়ী পেয়ে, ঝুমুর রিক্সার কাছে ফিরে এসে বলে, এই লেও তোমরা বকসিস, হামারা। কোঠি মিল গিয়া। ঝুমুর ওর হাতে দুটো টাকা দেয়। রিক্সাওয়ালা আশাতীত বকসিস পেয়ে চলে যায়। এবার ওর হাতের ঠুন ঠুনটা বেশ জোরে জোরে বাজতে থাকে।

ঝুমুর···নম্বর বাড়ীর দরজায় টোকা দেয়, কড়া নাড়ে, কিন্তু কারো কোন সাড়া নেই। শেষে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে থাকে।

ওপর থেকে প্রশ্ন আসে কে ?

দরজাটা খুলুন তো ?

মিনিট খানেক পরে সদর খুলে কে একজন প্রশ্ন করে—কাকে চাই, ঘরের সুইচ তখনও জ্বালা হয়নি।

ভেতরে ঢুকে সব বলছি ;

বাড়ীর মালিক তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে, বিস্ময়ে বলে ওঠে ঝুমুর !

হ্যাঁ, এইবার চিনতে পেরেছ ?

চিনেছি, কিন্তু ঘটনাটা ঠিক বুঝতে পারছি না ;

ওপরে চল সব বলছি।

ওপরে খেনোর ঘরে ওরা দু'জনেই এক খাটে বসে.

বাঃ বেশ মন্দ নয় আদর করে নিয়ে এলে। কিন্তু কথা বলছ না কেন ?

খুব অদ্ভুত লাগছে, শুধু ভাবছি এত রাত্রে বাড়ী চিনে এলে কি করে।

কেন রিক্সায় উঠে, আর বাড়ীর নম্বর তো আমার কাছেই ছিল। রিক্সাই আমায় এখানে নিয়ে এসেছে, আমি শুধু তোমার বাড়ীর নম্বরটা চিনে বের করেছি। এখন একটা কাজের কথা শোন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, শ্বশুর বাড়ী থেকে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গিয়েছিলাম একটা মহিলা আশ্রমে, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা দেখে, রাতারাতি পালিয়ে এলাম।

তুমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছ, ধেনোর চোখের পাতা ঘন ঘন নাচতে থাকে।

ঝুমুর ওর নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এইবার আমার হাত ধর।

না, ক্ষমা কর নিজেকে অসহায় মনে করে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্য আজকে তুমি আমার হাত ধ'রতে চাইছ।

ও, তোমার আত্ম-সম্মান বোধে দেখছি বড্ড বেধেছিল, তাই অতীতের কথা আজও ভুলতে পারনি। কিন্তু বধূবেশী ঝুমুরের উদ্ধার মানসে সেদিন যে নিষ্কাম কর বাড়িয়েছিলে, তার ভেতর কতটা সত্যতা ছিল ভেবেছিলে কি? বিয়ের বাসর থেকে যে পুরুষ নিজের মানসীকে তুলে নিয়ে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার বাসনা জানায় তাঁকে আমি সম্মান করি। কিন্তু তার কাছে আমি নিজেকে সমর্পন করি না। কেন না, নিষ্কাম কোন কথাকেই আমি বিশ্বাস করি না। ও কথাটা একটা মধুর বুলি, মিলনের পূর্বে চতুর প্রসাধন যেমন দেহকে আকৃষ্ট ক'রে চুম্বকের মত টেনে নেয় ঠিক আত্মাকে আকৃষ্ট করবার জন্য ঐ বিশেষ বুলিটি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। ইচ্ছে করে তোমার মিথ্যে সংযমের পোজটার মিথ্যে অর্থ গ্রহণ করিনি, এইটাই কি আমার বড় অপরাধ। আর......, আর একজনকে তিক্ত বিষের মত পরিত্যাগ ক'রে এসেছি যে বিয়ের

রাত্রে বিশ্রী কতকগুলো কদর্য্য ছবি দেখিয়ে শুভরাত্রির অর্থ বোঝায়।

ধেনো অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একটা সত্য কথা বলবে।

বল, বল্‌বো, ঝুমুর উত্তর করে।

তোমার মনে আমার স্থান কতটুকু।

"তোমার আদর্শ মনোভাবকে আমি ভালবাসি কিন্তু তোমাব প্রতি অনুরক্ত নই।"

মেয়ে মানুষ বিপদে পড়ে আমার আশ্রয়ে এসে আমাকে একটাও ভালবাসার কথা ব'ললে না, খুব অদ্ভুত তো?

ছোট বেলার ঝুমুর হয়তো এখনো বেঁচে আছে। থাক, সে সব কথা, দয়া করে আমার পরীক্ষাব ব্যবস্থা করে দিও।

একটু চা খাবে মৌমাছি? ধেনো ঝুমুরকে জিজ্ঞেস করে।

খেতে পারি তুমি যদি করে দাও।

কেন, তুমি করবে না।

না, আমার বর হলে ক'রে খাওয়াতুম, তুমি আমার ছোট বেলাব ধেনো লঙ্কা, বাদলা দিনে নিজের গেঞ্জি খুলে আমার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলে। স্বামীকে চা করে খাওয়ানোটা স্ত্রীলোকের একটা বাঁধা ধরা নিয়ম, তখন ইচ্ছে না থাকলেও কর্ত্তব্য পালন করতে হয়। তোমার আমার সম্পর্ক কোন কর্ত্তব্যের মাপ কাঠিতে দাগ টানা নেই, তাই তুমি চা করে খাওয়ালে আমি বেশী খুসি হব এ সত্যটা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছি না, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যে লুকোচুরি খুব বেশী, এমন কি দুজনের সত্য বয়স পর্য্যন্ত দুজনে জানে না। আমাদের সমাজের স্বামীরা স্ত্রীর কাছ থেকে সর্বদাই উদারতার আশা করেন, স্ত্রী হবেন সর্ব্বত্যাগী, নিরাসক্ত। এই জন্য গৃহবধূকে লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করা হয়, এই লক্ষ্মী সমতুল্যা হবার মহা মোহ কোন স্ত্রীলোকই ছাড়তে পারেন না। ফলে নিজের স্বাস্থ্য, শ্রী, উচ্চমনোবৃত্তি সব কিছুকে

বর্জ্জন করে ঐ চেষ্টাপ্রসূত উদারতার ভড়ঙের পেছনে সব কিছু খুইয়ে স্ত্রীলোক যখন নিঃস্ব হয়ে পড়ে, যখন স্বামীকে আকৃষ্ট করবার মত কিছুই থাকে না, তখন স্বামীর বাইরের টানই হয়ে ওঠে প্রবল, তবে অর্থের অভাবে, সামর্থের অভাবে পুরুষের বাইরের রূপটা খুব বেশী প্রবল হয়ে ওঠে না। এখন থাক এসব কথা, এসব কথা বেশী বললে প্রবন্ধ হয়ে ওঠে।

ধেনো ইলেকট্রীক ষ্টোভ জ্বেলে চা করে ঝুমুরকে দেয়। ওরা দুজনে আড় হ'য়ে শুয়ে, খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রেখে, গদির ওপর উপুড় হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে সন্তর্পণে।

দেশে গিয়েছিলে, ঝুমুর প্রশ্ন করে।

হ্যা গিয়েছিলাম, তোমার বাবা কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে গিয়েছেন।

শুনেছি, ভাবছি একবার দেখা করবো, আমাকে বিয়ে দিয়ে তিনি সুখী হননি, তাঁর বৃন্দাবন যাবার আর কোন কারণ নেই, ওটা ওঁর কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত। আমায় একটা চিঠিও দিয়েছেন অনেক দুঃখ ক'রে।

আমার জ্যেঠাইমা ভাল আছেন তো ?

ভালই আছেন, তবে তোমার উপর খুব প্রীত নন, তাঁর কাছেই শুনলাম তুমি নাকি শুভ রাত্রেই কার সাথে পালিয়ে গেছ। দেশের লোক অনেকে আমাকেই সন্দেহ করে।

ঝুমুর হেসে বলে হাঁ বোকারা ঐ রকমই ভাবে। পালিয়েছি কার সাথে শুনবে ?

ধেনো হেসে বলে কঙ্কন বাবু ? নাম শুনে কঙ্কনের সম্পূর্ণ চেহারাটা ঝুমুরের চোখের উপর প্রতিচ্ছবির মত ভেসে ওঠে। একটু পরে বলে। সুন্দরী এক দিদিমার সাথে। তিনি প্রচুর বিত্তশালীনি। কিন্তু হঠাৎ কঙ্কন বাবুর দাদার নাম না করে কঙ্কন বাবুর নাম করলে কেন ? আমার তো তাঁর সাথেই সম্বন্ধ হ'য়েছিল আর তিনিই আমাকে অপছন্দ করেছিলেন।

কিন্তু সত্যি কথা বল তো তুমি কাকে পছন্দ করেছিলে ?

ক'নে দেখতে এসে একবার দেখেই, দ্বিতীয়বার দেখবার জন্য সংবাদ পত্রের পাতা থেকে যিনি মুখ তোলেন নি, তিনি যে আমাকে প্রথম দৃষ্টিতেই অপছন্দ করেছেন, এ কথাটা বুঝতে আমার বেশী সময় লাগেনি। আর তাঁর ছোট ভাইয়ের কথা বলছ, উনিশ বিশ বৎসর বয়সে পুরুষের চোখের ভাষা পাঠ করতে মেয়েদের বেশী সময় লাগে না। থাক সে কথা,—

আমার জ্যেঠাইমা তোমাকে নিশ্চয়ই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন নি।

মোটেই না ধেনো হাই তুলে উত্তর দেয়। তুমি জ্যেঠাইমাকে সব খুলে একটা চিঠি দিলেই পার।

না, দেবো না। তিনি নাকি বলেছেন আমার মুখ তিনি দেখবেন না, মেয়ে বিয়ে দিয়ে, পরের কথা শুনে, বিয়ের পর বেঁচে আছে কিনা এমন খোঁজটাও যাঁরা নেন না, তাঁদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবো কিন্তু তাঁদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ থাকবে না।

তোমাকে তোমার জ্যেঠাইমা অনেক কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁর ওপর তোমার অভিমান করা উচিৎ নয়। যদি সম্ভব হয় আমার হাতে চিঠি দিও, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ঝুমুর বলে,—মাধবী কিন্তু ঠিকই বলেছিল, ঝুমুর স্বামীর ঘর করতে পারবে না।

ধেনো দুঃখের শব্দ করে বলে আহা, সে বেচারীর কথা বলো না। বিয়ের দেড় বৎসরের মাথায় বিধবা হয়েছে, ওর স্বামী বড্ড ভাল মানুষ ছিল।

বিধবা হয়েছে! কি বলছ তুমি ?

হ্যাগো হ্যা, ন্যাড়া হাত, থান পরা, চুল গুলোতে কদম ছাঁট, নিজের চোখে দেখে এসেছি।

ছিঃ ছিঃ এতটুকু মেয়ের ওপর ওদের পরিবারের কোন দয়ামায়া নেই। এত কঠিন নিয়ম ওকে পালতে দিয়েছে কেন ?

এতে ওদের পরিবারের কোন দোষ নেই, ও নাকি নিজের ইচ্ছেয় সব করেছে। মহান স্বামীর স্মৃতি স্ত্রীরা বড় আদরে বড় পবিত্রতার মধ্যেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ঠিকই বলেছ, আমার মত সধবার চাইতে, মাধবীর মত বিধবার অনেক শান্তি অনেক সম্মান।

রাত্রি তখন চারটে, রাস্তায় ধাঙ্গড় কাজ আরম্ভ করছে, গভীর রাত্রে তাদের কাজের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে, ময়লা টানবার গাড়ীগুলো, গড় গড় শব্দ করে চলেছে ধেনোর বাড়ীর সামনে দিয়ে। ধেনো উঠে ঘড়িটা একবার দেখে, ঝুমুরকে ঘুমন্ত দেখে ও ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ওর মনে রাহুলের বুভুক্ষা জেগে ওঠে কিনা বোঝা যায় না, ও পাশের ঘরে গিয়ে ক্যাম্প খাট বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঝুমুর তিন দিন ধেনোর ওখানে থেকে হাইজিন পরীক্ষা দেয়। আজ আট দিন হ'লো জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে ও এসেছে, তাই পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে ও বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়। ধেনোর হাতে রোল নম্বর দিয়ে বলে, পাশের সংবাদ যদি পাও তবে এই ঠিকানায় চিঠি দিও।

চিঠি কেন তোমার ওখানে বুঝি দেখা করা সম্ভব নয়? ধেনো ঝুমুরকে প্রশ্ন করে।

না দেখা করাই ভাল। চিঠি লিখে নীচে একটা মেয়েলী নাম লিখো, আর পাশ করেছি এ কথা লিখো না, যদি ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করি তবে লিখো, সুর প্রথম ছেলেটি ভাল আছে।

এত মিথ্যে বলতে হবে বিদ্যা অর্জ্জনের ব্যাপারে।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ধেনো একটু দুঃখের হাসি হাসে।

আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যাপারটা একটু জটিল, তারকেশ্বরের টাইম টেবল দেখে তবে আমায় বাড়ী যেতে হবে। কিন্তু তুমি তো

আমার সঙ্গে যেতে পারবে না, একটা রিক্সায় আমায় চাপিয়ে দাও।

তুমি বাড়ী চিনে যাবে কি করে।

তাও তো বটে।

ধেনো বলে তার চাইতে এস দুজনে দুটো রিক্সা করি জোড়াসাঁকোর বাঁক পর্যন্ত তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমার রিক্সা সোজা চলে যাবে আর তুমি তোমার বাড়ীতে গিয়ে উঠবে, রাস্তায় পড়লে তোমার বাড়ী তুমি চিনে নিতে পারবে তো?

তা পারব ঝুমুর বলে।

দুজনে দুটো রিক্সায় চড়ে বসে, কথামত জোড়াসাঁকোর বাড়ীর কাছে ধেনোর রিক্সা একটুও না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যায়। ঝুমুরের রিক্সা সদরে থামতেই দরোয়ান ওর জিনিষগুলো নিয়ে যায়, ঝুমুর ঘোমটা টেনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মোক্ষদার সাথে ঝুমুরের দেখা।

মোক্ষদা একগাল হেসে বলে, এসেছ বাছা, কিন্তু এলে কি করে ঘরের গাড়ী তো যায় নি।

না, তারকেশ্বরের বুড়ো পাণ্ডার সাথে এলাম।

কোথায় তিনি?

তিনি নামলেন না, বললেন বড্ড জরুরী কাজ আছে। আজকে আর নামবো না, বাড়ী দেখে গেলাম, আর একদিন আসবো।

তা বউমা বাবার কি আদেশ হলো।

ঝুমুব বিষণ্ণ মুখে বলে, এবার কিছুই পেলাম না। আমাকে আর একবার যেতে হবে। গিয়ে অবধি দিদিমার জন্য মনটা ভারী চঞ্চল ছিল, ঝুমুর মোক্ষদাকে প্রশ্ন করে, দিদিমা ভাল আছেন তো?

না গো, সরকার মশায় তাঁকে আনতে গিয়েছেন। আসছে বুধবার তিনি এখানে আসছেন শুনছি নাকি বেশী রকম অসুখই হয়েছে, বিভূতিও কাশী গিয়েছে, যাবার আগে আমার সাথে একবার দেখা করেও যায় নি। মনের আর দোষ কি বাছা, দিদিমা

তোমায় যা ভাল বাসেন, তাঁর অসুখে মন তো তোমার সাড়া দেবেই।

দিদিমার অসুখ শুনে ঝুমুরের মন সত্যি সত্যি খারাপে হয়ে পড়ে। বিভূতির হাত থেকে দিদিমাই ওকে উদ্ধার করে এনেছিলেন, দিদিমার কিছু হলে নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে ঝুমুর একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ও মোক্ষদাকে বলে দিদিমার কিছু হলে আমি বাবার কাছে বৃন্দাবনে চলে যাব।

বুধবার দিন দিদিমাকে এমবুলেন্স থেকে নামানো হয়। দিদিমা "ড্রপসি"তে ফুলে চার ডবল হয়েছেন। বিভূতি, সরকার মশায় · আর পাড়ার ছেলেরা ষ্ট্রেচারে করে দিদিমাকে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে তুলতে থাকে। বিভূতির চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা। কিন্তু সংজ্ঞাহীন দিদিমা সে ব্যস্ততার কোন কিছুই দেখেন না। বড় বড় ডাক্তারে বাড়ী ভর্ত্তি হয়ে যায়। ঝুমুর দিন রাত্রি জেগে দিদিমার সেবা করে।

বিভূতির চোখে মুখে দুর্ভাবনা মোক্ষদাকে একা পেয়ে আস্তে আস্তে বলে, দেখ মোক্ষদা আমার অদৃষ্ট বড়ই খারাপ, গিয়ে অবধি দিদিমাকে অজ্ঞান অবস্থাতেই দেখলাম, একটা কথাও বলা হলো না, বউটা কি বেড়াট দেখেছিস, সেবার অজুহাতে কেমন সবার সামনে বেরুচ্ছে। আচ্ছা মোক্ষদা দিদিমা কি উইল টুইল কিছু করেছেন ?

করেছেন, বোধ হয় নাত-বউয়ের নামে, উত্তর দিয়েই মোক্ষদা মহা বিরক্ত হয়ে বলে। কি যেন বাছা এসব কথা জিজ্ঞেস করবার কি সময় পেলে না।

দিদিমাকে তখন অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। তিন দিন পর্যন্ত দিদিমার বেঁচে থাকবার বাসনা দিদিমাকে অনেক কষ্ট দিল, রবিবার প্রভাতে দিদিমার অন্তিমের ডাক এল।

বিভূতি দিদিমার পায়ের ওপর মাথা রেখে বলতে থাকে—,দিদিমা যাবার আগে আমাদের দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে গেলে না!

ঝুমুর তখন দিদিমার মুখে শেষ গঙ্গাজলের কোঁটা দিলো, ঘরের

সমস্ত লোকেরা সমস্বরে বলে উঠলো 'হরিনারায়ণ ব্রহ্ম'। ডাক্তাররা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

উঠানে তখন লোকে লোকারণ্য, কিছুক্ষণের মধ্যে কীর্ত্তনীয়ারা এসে দাঁড়াতেই, দিদিমার অন্তিম কাজের সাথীরা কাঁধে গামছা নিয়ে প্রস্তুত হলো।

বিভূতি মোক্ষদাকে জিজ্ঞেস করলো—দিদিমার সিন্দুকের চাবি?

কেন সিন্দুকের চাবি নিয়ে কি করবে?

আমার রাজরাণী দিদিমাকে ভিক্ষুকের মত বিদায় করবে নাকি?

এত সব বুঝিনে বাবা, দিদিমার কথা মত চাবির মালিকের হাতে চাবি দেবো।

উঠানে তখন অনেক লোক, মোক্ষদা পাড়ার কয়েকজন প্রবীণকে সাক্ষী রেখে বলে—, শুনুন বাবুরা দিদিমার কথামত আপনাদের সবার সামনে নূতন বউমার হাতে চাবি আর উইল দিলাম আপনারা সবাই সাক্ষী রইলেন।

ঝুমুর চাবি আর উইল দিদিমার চরণ স্পর্শ করিয়ে নিয়ে, আঁচলে বেঁধে নিলে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়লো।

বিভূতি তখন অপমানে আহত হয়ে বলে, মোক্ষদা তোর স্পর্দ্ধা চরমে উঠেছে, দিদিমার শ্মশানের কাজ শেষ করে, তারপর কি করে কি বুঝে নিতে হয় আমিও দেখে নেবো। কথাগুলো বিভূতি সবার অলক্ষ্যে মোক্ষদাকে বলে। মহা সংকীর্ত্তনের মাঝে দিদিমা মহা যাত্রা করেন। ঝুমুরের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। দিদিমার সাথে বিভূতিও শ্মশানে যায়।

ওরা সবাই চলে যাবার পর ঝুমুর দিদিমার খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে কাঁদতে থাকে; দিদিমার দোক্তার কৌটোটা অমনি পড়ে আছে। সাদা গরদের থান দিদিমা স্নানের পর নিত্য ব্যবহার করতেন, তারে ভেতর দিদিমার মাথার তেল, গায়ের গন্ধ, জীবন্ত স্মৃতির মত এখনো

ফুটে আছে, দিদিমার হরিনামের শুদ্ধ স্ফটিকের মালা সাধনার সাক্ষী হয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে পড়ে আছে রামায়ণ মহাভারতে, পাতা উলটাবার আঙ্গুলের দাগ এখনো পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দুদিন বাদে এরাও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে।

মোক্ষদা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা জোর করেই বজায় রেখেছে। ঝুমুরকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, বউমা এখন কি কাঁদবার সময়, তিনটে বছর তো দিদিমার ছায়ার নীচে মানুষ হলে। এখন একবার নিজের কথা ভাব। বিপুল সম্পত্তি পেয়ে বিপদ তোমার বাড়লো বই কমলো না। শ্মশান থেকে ফিরে এসে বিভূতি যে কি করবে ভেবেও পাচ্ছিনে।

ঝুমুর চাবি আর উইল মোক্ষদার হাতে দিয়ে বলে, তুমি যেমন দেখছিলে তেমনি দেখ মাসী, আমি এসবের কিছু বুঝিনে।

মোক্ষদা চাবি আর উইল কোমরের বটুয়াতে রেখে বলে, স্বামীটাকে মোটেই আমল দিও না। এখানে এসে অবধি উইল উইল করে আমার মাথা খেয়ে ফেলেছিল। মানুষ কি এত পিশাচ হয়। দিদিমা বুঝে সুঝেই তোমার নামে সব দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া কাশী যাবার আগে একদিন বলেছিলেন, জিদ করে ওর দায়িত্ব নিয়েছি, তাই অর্থের দিক থেকে ওকে আমি রাজরাণী করে যাব।

শ্মশানের কাজ শেষ করে বিভূতি এ বাড়ীতেই ফিরে আসে, বাড়ীতে পা দিয়েই বলে—দিদিমাগো তুমি আমার ওপর একটুও সুবিচার করে গেলে না।

মোক্ষদা এসে ওকে জামা কাপড় দিয়ে বলে—কেঁদোনা বাপু, বুড়ো হয়েছিলেন পুণ্যি কাজ দান ধ্যান অনেক করে তাঁর সুকৃতি নিয়ে তিনি বিদায় হয়েছেন, এইবার উঠে কাপড় বদলে, জল টল একটু মুখে দাও।

বিভূতি মোক্ষদার কথা মত সবই করে। একটু আশ্বস্ত হয়ে বলে দিদিমার উইলটা একবার দেখতে দেবে।

তা বাছা আর দেবো না, সবই তো তোমার বউয়ের নামে, ঐ হরে দরে তোমারি তো সব হলো। ওপরে চল দেখাচ্ছি।

বিভূতি ওপরে এসে ঝুমুরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আমার বউ ! যে বউ আমার ঘর করেনা, সে আমার বউ নয় ! পাড়ার পাঁচ জনকে ডেকে আমি এক্ষুনি আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে দেবো। কোন আইনে আমার ঘর না করে আমার বউ হিসাবে উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিভূতি মোক্ষদাকে জিজ্ঞেস করে এডভোকেট অদ্বৈত রায় কে ?

মণ্টুর বাবা গো, উনিই তো দিদিমার আইন কানুনের ব্যবস্থা করতেন, আচ্ছা দাঁড়াও বাছা আমি ওঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

ঝুমুর তখন পুরোহিতকে দিয়ে মৃতের ঘরে গীতা পাঠ করাচ্ছে ধুপ ধুনা দিচ্ছে।

এডভোকেট অদ্বৈত রায় উঠানে হাঁক ছেড়ে বলেন—, কই গো মোক্ষদা তোমরা সব কোথায়।

মোক্ষদা তাড়াতাড়ি এসে গড় হয়ে প্রণাম করে। বিভূতিও সাথে সাথে নীচে নেমে আসে।

এডভোকেট অদ্বৈত রায় বলেন আমাদের বউমা কোথায় !

বউমা আপনাকে ডাকেনি, ডেকেছি আমি। বিভূতি উত্তর করে।

তা আমাকে এই অসময়ে প্রয়োজন হলো কেন।

এই উইল সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। মোক্ষদা কোমরের খোঁট থেকে উইল বের ক'রে অদ্বৈত রায়ের হাতে দেয়।

বিভূতি আর অদ্বৈত রায় ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে।

বিভূতি প্রশ্ন করে—, দিদিমা উইলটা কি ভাবে করেছেন ?

অদ্বৈত রায় উইল খুলে বলেন—সমস্ত স্থাবর অস্থাবর, যেখানে যা আছে সব বউমার, তবে একটা কথা গিন্নীর যে যে অনুষ্ঠানে যে জাতীয় দান ছিল সমস্ত দানই পূর্ব্ববৎ রক্ষা করতে হবে। আর এ সম্পত্তি দান বা বিক্রীর অধিকার বউমার নেই।

আপনি হয়তো জানেন না যে আমার স্ত্রী আমার ঘর করেন না। সে অনেক কেলেঙ্কারীর কথা, আপনাকে সে সব কথা বলতে চাইনে।

যিনি আমার ঘর করেন না, তিনি যে আমার স্ত্রী হিসাবে কিছুই পেতে পারেন না, এই কথাটা একবার তাকে জোর গলায় শুনিয়ে দিন তো।

ঝুমুর তখন এক গলা ঘোমটা দিয়ে ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে আছে।

অদ্বৈত রায় বলেন, আপনি ভুল ক'রছেন, আপনার স্ত্রী হিসাবে উনি কিছুই পান নি উইলের একটি জায়গাতেও আপনার কথা উল্লেখিত নেই। সব জায়গাতেই লেখা আছে আমার প্রতিপালিত কন্যা শ্রীমতী ঝুমুর সর্ব্ব সম্পত্তির অধিকারী।

বিভূতি চোখ বড় বড় করে বলে বলেন কি মশায়, এটা নিশ্চয়ই জাল উইল।

আপনি আবার ভুল করছেন, উইল তিনি প্রোবেট পর্য্যন্ত করে গেছেন। বুড়ো গিন্নীর আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ আমিই চিরকাল করে থাকি। আর আপনি বা এত অধীর হচ্ছেন কেন, আইনে থাকুক আর না থাকুক, আপনি নিজে তো জানছেন সমস্তই আপনার।

যান, যান মশায় ওসব কথা রেখে দিন বিভূতি উগ্রতায় অধীর হয়ে ভদ্রতার মুখোসটাও খুলে ফেলে।

অদ্বৈত রায় অপ্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

কাকাবাবু, পেছন থেকে ঝুমুর ডাকে।

কে, বউমা, কিছু বলবার আছে।

সম্পত্তিগুলো ওঁর নামে লিখে দেওয়া যায় না ?

না মা আপনি ভোগ করবার অধিকারী দানের অধিকারী নন, আর বুড়ো গিন্নী কাশী যাবার আগে সজ্ঞানে সবার সামনে উইলটী করে গেছেন। উনি হয়তো নিরক্ষর বিধবা ছিলেন, কিন্তু বিচারের আসনে বসে কারো প্রতি অবিচার করেন নি।

ঝুমুর মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অদ্বৈত রায় চলে যাবার পর বিভূতি স্বমূর্ত্তি ধারণ করে, পায়ে চটি জুতো গলিয়ে সারা বাড়ীময়

হেঁটে হেঁটে বলতে থাকে আমি অশৌচের কোন নিয়ম মানবো না, এই বাড়ীতে জুতো পরবো। এইখানে বসে মাছ মাংস খাব।

মোক্ষদা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে, বউমা দেখে যাওতো একবার দাদাবাবুর কাণ্ডটা।

ঝুমুর বাইরে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর যশোদাকে ডেকে বলে, যশোদা তোমাদের দাদাবাবুকে বলো, এ বাড়ীতে থাকতে হলে এই দশদিন সমস্ত আইন মেনে চলতে হবে, উনি সবকিছুই করতে পারেন আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এ বাড়ীতে বসে নয়, বাড়ীর বাইরে গিয়ে। দিদিমার শেষ যা কাজ সব আমিই করবো।

বিভূতি চীৎকার করে বলে শুনলি, শুনলি, মোক্ষদা!

তা বাপু জুতোটা তুমি খুলেই ফেল না, তোমারি বা এত জিদ কেন।

না মোক্ষদা মাসী! এ বাড়ীর রীতি নীতি এত অবহেলার জিনিস নয়। এই মুহূর্ত্তে ওকে যেতে বলে দাও। শ্মশান বন্ধু হিসাবে প্রীতি ভোজের নিমন্ত্রণ রইল, কিন্তু আজ থেকে এ বাড়ীর উনি কেউ নন।

দেখ মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। আমার দিদিমার টাকা পেয়ে আমাকেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

দিদিমা থাকতেও আপনি কেউ ছিলেন না দিদিমা অভাবেও আপনি এ বাড়ীর কেউ নন।

বেশ তবে চললাম কিন্তু আমিও দেখে নেবো এ বাড়ীতে আমার কোন অধিকার আছে কি না। বিভূতি সত্যি সত্যি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

ঝুমুর পরম নিষ্ঠাচারে দিদিমার মৃতাশৌচ পালন করতে থাকে। একটা একটা দিন করে দিদিমার মৃত্যুর সাত দিন কাটে, বাড়ীতে শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যাপার আরম্ভ হয়। পাড়ার পাঁচজন

ও দিদিমার দূরতর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রত্যেককেই শ্রাদ্ধ বাসরে আমন্ত্রণ করা হয়। মোক্ষদা বলে—বউমা বুড়ো গিন্নির কলকাতার অনেক প্রতিষ্ঠানেই দান ছিল, প্রত্যেক বৎসর পুজোয় উনি নিজে গিয়ে অনাথ আশ্রম, বিধবা আশ্রমের অনাথাদের নিমন্ত্রণ করতেন, সরকার মশায়ের কাছে এই সব আশ্রমের লিষ্ট রয়েছে, যদি পার বাছা তুমি নিজে গিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করে এস।

ঝুমুর সহজেই মোক্ষদার প্রস্তাবে সম্মত হয়, নিমন্ত্রণের লিষ্টটা হাতে নিয়ে যশোদার সাথে বাড়ীর গাড়ীতে রওনা হয়। চার পাঁচটা প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঝুমুর কলকাতার একটু বাইরে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম করে। ড্রাইভার কথা মত সেইখানে এসে গাড়ী থামায়। যশোদার চিরকেলে স্বভাব বসতে পারলে সহজে উঠতে চায় না, পরিশ্রান্ত শরীরে গাড়ীর দোলা পেয়ে ওর রীতিমত ঝিমুনী ধরেছে, যথা স্থানে গাড়ী থামলে যশোদা বলে—বউমা বারে বারে আর ওঠা নামা করতে পারি নে। ঘরের দোরে গাড়ী রইল, তুমি বাপু একাই যাও। ঝুমুর অনুরোধ উপরোধ করেও ওকে নামাতে পারে না, শেষে বলে, মোক্ষদা মাসী আমায় বেশ লোক সাথে দিয়েছে, তুই না গেলে ওদের সাথে আমায় পরিচয় করিয়ে দেবে কে শুনি?

ও বাছা চিনিয়ে আর দিতে হবে না, তোমার হীরের চুড়ি দেখেই ওরা তোমায় চিনে নেবে।

যশোদার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা দেখে ঝুমুর একাই আশ্রমে ঢুকে পড়ে। বাড়ীটার উঠানে এক কাঁড়ি আগাছা জন্মেছে, উঠানের ওপর শ্যাওলা জন্মে কালো মাটীর রং আবছা সবুজ বর্ণ হয়েছে। পিচ্ছিল পথের ওপর সারি সারি ইট পেতে চলার পথ করে নেওয়া হয়েছে, ছাদের ফাটলে বড় বড় বট পাকুড়ের জন্মের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর ভেতর বহুকাল চূণ ফেরানো হয় নি, বৃষ্টির কালো ছিট দেওয়াল ময় মীনে চিহ্নর দাগ হয়ে আছে। সমস্ত বাড়ীটা ভূতুড়ে বাড়ীর মত সম সম করছে। উঠানের পাশে কতগুলো

টাট্‌কা এঁটো কলাপাতা দেখে ঝুমুর সাহস করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চাপা কান্নার শব্দ শুনে ঝুমুর একটু থমকে দাঁড়ায়। কে একজন খুব জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একটা কর্কশ কণ্ঠ একটু নরম সুরে বলছে,—ও বাছা কত মা এমন সন্তান ফেলে চলে যায়, দেশে গিয়ে দু'চার মাস টাকা পাঠায়, তারপর বে'থা হয়ে নূতন সংসার পেয়ে সবাই সব ভুলে যায়।

ক্রন্দনরতা মেয়েটি ওর কথা শুনে আরও জোরে কাঁদতে থাকে।

আর একটা অপরিচিত কণ্ঠ বলে তোমরা টাকা পয়সার কথা কি বলছ। পরিচয় দেওয়া নিষেধ, নইলে বাপের নাম শুনলে হ্যাঁ হয়ে যাবে হাজার হলেও প্রেথম সন্তান তাও আবার পুত্র সন্তান, কাঁদবে বই কি?

মেয়েটি ক্রন্দনে উচ্ছসিত হয়ে বলে, দয়া করো, মাণিককে আমার ইঁদুর বাঁদর দিয়ে খাইও না পেট ভরে খেতে দিও। শীতের দিনে জামা পরিও।

ঝুমুর এদের কথাবার্ত্তা শুনে একেবারে কাঠ হ'য়ে যায়! তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পাশের অন্ধকার ঘরে ঢোকে। ঘরটায় আলো বাতাসের নাম গন্ধ নেই। ঘরে ঢুকে ঝুমুর ভয়ে আৎকে ওঠে পনেরো ষোলটি সদ্যজাত শিশু পড়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর। হাড় জিরজিরে চেহারা, পিঁপড়েতে ছেঁকে ধরেছে, উগ্র ক্ষুধার তাড়নায় নিজেদের আঙ্গুলগুলো আপ্রাণ চেষ্টায় চুষছে, ধেড়ে ইন্দুরগুলো নখের কোনগুলো খুটে খুটে খাচ্ছে। কি তাদের চীৎকার, ওঁয়া, ওঁয়া, ওঁয়া, সে ওঁয়া ডাকের সাড়া দেবার মত, ওঘরে কেউ নেই। পড়ো বাড়ীর ভুতুড়ে হাওয়া, এক একবার ঘুলঘুলি দিয়ে শোঁ শোঁ করে ঢুকে সেই অসহায় কান্নার প্রতিধ্বনির শেষ সুরটা বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে—খুব আস্তে।

ঝুমুর ভয় পেয়ে আবার সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। একা

গাড়ীতে ফিরে যেতেও তার সাহস হয় না। দরজার ফাঁক দিয়ে ঝুমুর আড়ি পেতে দেখতে থাকে। একটি সুশ্রী সুন্দর মেয়ে বাইশ তেইশ বৎসর বয়স, গুচ্ছে গুচ্ছে রুক্ষ চূর্ণ কুন্তল মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। একটা ছোট্ট ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। তারি সামনে দাঁড়িয়ে একটা কদাকার স্ত্রীলোক তাকে ব'লছে—, টাকা যতদিন দেবে ভালভাবেই রাখবো, আমরাও তো মেয়েমানুষ বাছা।

মেয়েটির ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিপছিপে কালো বিধবা, মেয়েটির ঝি টি কেউ হবে, বলছে—নাও গো দিদিমণি, তোমার মাণিককে ওদের হাতেই দিয়ে দাও। কেঁদো না সাতদিন বাদে আমি আবার তোমায় এখানে নিয়ে আসব। মাঝে মাঝে আসতে তো আর দোষ নেই।

কদাকার স্ত্রীলোকটি তখন বলতে থাকে, ছেলের জন্য তো পাঁচশ টাকা দিয়েই যাচ্ছ। পাঁচ মাস তোমার ছেলে ভালভাবেই বেঁচে থাকবে। দাও বাছা ছেলেটিকে, স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

সুন্দর মেয়েটি শিশুটিকে দিতে গিয়ে, বুকের মধ্যে জাপটে ধরে কাঁদতে থাকে।

ওর ঝি এবার ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে বলে তাড়াতাড়ি কর দিদিমনি, বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর অপেক্ষা করলে সাত জানাজানি হবে। তিন মাস বাদে তোমার বিয়ে, মা বাপ খুব ক্ষমা করেছে। এর পরও যদি কান্নাকাটি কর, হয়তো তোমাকে বাড়ীতেই ঢুকতে দেবে না।

মেয়েটি শিশুটির মুখে বারে বারে বিদায় চুম্বন এঁকে দেয়, তারপর ঐ কদাকার স্ত্রীলোকটির হাতে শিশুটিকে তুলে দিতে যাবার মুহূর্তে, ঝুমুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—দাঁড়াও এত তাড়াতাড়ি তোমায় আমি ছেড়ে দেব না।

মোটা মেয়েছেলেটি ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে, কে, কে তুমি?

আমি যেই হই, পরিচয় তোমায় দেবো না, সুন্দর মেয়েটিকে বলে। ভালবেসে যখন শিশুটিকে জন্ম দিয়েছিলে, তখন কি, মা, বাবা, সমাজ, সংসার আর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলে, বল তোমার নাম কি ?

মেয়েটি আসামীর মত মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওঃ উত্তর দেবে না, ভবিষ্যতের আশা হয়তো নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় না ? তুমি তো অজ্ঞ কিশোরী নও, বোঝবার বয়স তোমার হ'য়েছে। এ বয়সেও কি তুমি বুঝতে পার নি, এক জাতীয় পুরুষের মনোভাব, সমাজের ছাড়-পত্র আঁটা দেহ-মনে কুৎসিৎ স্ত্রীলোককেও ওরা সংসার সঙ্গিনী ক'রে সুনাম বজায় রাখে, কিন্তু তোমার মত হৃদয় সঙ্গিনীকে ওরা উপভোগ ক'রেই যায় কিন্তু অধিকার দেয় না। বল এ শিশুর জীবনের জন্য দায়ী কে ?

মেয়েটি উত্তর করে, আমাদের সমাজ ?

মিথ্যে কথা তোমাদের মোহ, সমাজ এ কথা তোমায় বলেন নি যে তুমি শিশু হত্যা কর। জননী হ'য়ে সন্তানকে পরিত্যাগ কর। নিজের দেহ-বৃত্তিকে আগে দায়ী কর, সমাজ তার পরের কথা। তুমি যদি ওকে বুকে ক'রে বল ও আমার সন্তান, সমাজ তোমাকে ব্যঙ্গ করবে কিন্তু ইঁট ছুঁড়ে মেরে ফেলবে না, ভেবে দেখ সমাজকে তুমিও ব্যঙ্গ ক'রছ, পিতা হবার সাহস যার নেই তাঁকে দেহের অধিকারী ক'রে সমাজকে তুমিও ছোট করেছ, ভবিষ্যতের আশায় প্রলুব্ধ হ'য়ে তুমি আজ সন্তান ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ। এ জন্য সমাজ দায়ী নয়।

আমি ছেড়ে যেতে চাইছি না, ওরা আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

পাশের ঘরের শিশুগুলোকে দেখেছ কেমন ইঁদুর আর পিঁপড়ে মিলে ভাগ ক'রে খাচ্ছে। এত দেখেও তোমার নিজের সন্তানের ওপর এতটুকু দয়া হচ্ছে না, শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলেই

মাতৃত্ব হয় না, আমি বলছি তুমি ওকে তোমার সাথে নিয়ে যাও।

ও বাবা, তা কি ক'রে হয়, মেয়েটির ঝি ওর হাত ধরে জোর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। মেয়েটি ঝুমুরের দিকে হাত বাড়িয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে, ঝুমুর দেখে ওর হাতের ওপর উল্কি দেওয়া ছোট্ট একটি নাম।

ঝুমুর ওর হাত না ধরে বলে—ভুলে যাও তুমি কোন দিন মা হয়েছিলে, যেমন ক'রে এদের মা'রা সব ভুলে গিয়েছে। ঝুমুর অঙ্গুলি নির্দেশে অন্ধকার ঘরটা দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে—বাপিরে, মাণিক রে, খোকন রে।

ঝিয়ের প্রবল ধমকে কান্না উঠানের সামনেই থেমে যায়।

ঝুমুর স্থির হ'য়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে নিঃশ্বাসের সাথে সাথে। কদাকার স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে ঝুমুর বলে, তুমি এ শিশুগুলোকে বিষ দিয়ে মেরে ফেল না কেন ?

ওমা, এমন পাপের কথা বলতে আছে !

হুঃ পাপপুণ্যের জ্ঞান এখনো তোমার আছে দেখছি। বল এই শিশুগুলোকে দিয়ে তুমি কি কর, নইলে এক্ষুণি আমি পুলিশ ডাকবো, গেটে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

স্ত্রীলোকটা মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, পুলিশে আমার ভয় নেই মা, কিন্তু পুলিশ এলে যে পাঁচশ টাকা আজ পেয়েছি সব ক'টি টাকা খসে যাবে তাদের ছিচরণে।

বুঝেছি এসব কাজ করতে করতে পাকা হ'য়ে উঠেছ তাই ভয়ও কাউকে পাও না, শোন এই সুন্দর ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে বিক্রি করবে ?

কত টাকা দেবে মা।

কত চাও ?

মাদ্রাজী ভিক্ষুকগুলো একশ, একশ পাঁচ, এই রকম দেয়। কিন্তু এত মোটা মোটা সোনার চাঁদ তারা চায় না, তারা চায় হাত-পা ভাঙ্গা, অন্ধ, আবার ভাল ছেলেদের হাত-পা ভেঙ্গেও নেয়।

কি বললে তুমি, ভাল ছেলেদের হাত পা ভেঙ্গে নেয়!

নেয় বই কি মা।

তুমি মেয়েমানুষ নও—তুমি শয়তান, ঝুমুর রাগে কাঁপতে থাকে।

কদাকার স্ত্রীলোকটি বলে, আমরা তো এসব ছেলের মা নই মা, শয়তান হবো কি করে? ছেলে প্রসব ক'রে যারা ছেলে ফেলে রেখে চলে যায় তারা কি আমার চাইতেও শয়তান নয়?

তুমি পরের ছেলে বিক্রি ক'রে ব্যবসা কর। না খেতে দিয়ে মেরে ফেল। শিশু দেহ ইঁদুর বাঁদর দিয়ে খাওয়াও।

মায়ের বুকে শিশুর আহারের জন্য ভগবান স্তন দিয়ে থাকেন, শিশুর মুখের আহার কেড়ে নিয়ে মা সন্তান ফেলে পালিয়ে যায়, সে সন্তানের খাদ্য কে দিতে পারে মা? দু'এক মাস টাকা দিয়ে আর কেউ টাকা দেয় না; এমন কি সন্তান ফেলে যাবার সময় মিথ্যে ঠিকানা দিয়ে যায়, কোন দিন সন্তান বড় হ'য়ে যেন ফিরে তাদের কাছে যেতে না পারে এই উদ্দেশ্য। শিশুগুলোকে, সত্যি কথা ব'লতে কি মা; টাকা যতদিন পাই ভালভাবেই খেতে দি, কিন্তু টাকা না পেলে, নিজেই বা কি খাই, ওদেরি বা কি খাওয়াই।

তোমাকে টাকা দিলে তুমি ওদের খাওয়াবে?

নিশ্চয়ই ওদের আমি ভালভাবে রাখবো?

আমি সামনের সপ্তাহে আবার দেখতে আসব। এই নাও পাঁচশ টাকা, ওদের খরচ বাবদ তিনশ, আর এই ছেলেটিকে কিনে নিলাম দু'শ দিয়ে।

স্ত্রীলোকটি হাতপেতে টাকা নিয়ে বলে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন মা।

কিন্তু ও ছেলেগুলো কি বাঁচবে ?

খুব বাঁচবে, তুমি সামনের সপ্তাহে এসে দেখো। হ্যাঁমা তুমি বুঝি ভারী টাকার মানুষ।

হ্যাঁ আমার অনেক টাকা, আর ঐ শিশুগুলোকে যদি তুমি ভালভাবে রাখ, আমি তোমায় অনেক টাকা দেবো। কিন্তু আমি যে এই শিশুটিকে নিয়ে যাচ্ছি, ওর মা যদি কখনো ওকে দেখতে আসে তুমি তাকে কি ব'লবে ?

হ্যাঁ, তুমিও ভাল মানুষ। যাবার বেলায় কত মেয়ে এমনি ক'রেই কাঁদে, কত বুক চাপড়ায়, চুল ছিঁড়ে, মাটিতে মাথা ঠুকে-ঠুকে মাথা ফুলিয়ে ফেলে, ব্যাস্ ঐ পর্য্যন্তই, কেউ আর দ্বিতীয় বার ফিরে আসে না।

ঝুমুর শিশুটিকে কিনে নিয়ে যাবার সময় ওকে বলে, আমি সাতদিন বাদে আবার আসব।

মোটা মেয়ে মানুষটি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে ভালই হ'লো মা, এ পাপের থেকে তুমিই আমায় উদ্ধার করলে। অন্ধকার ঘর থেকে তখন অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসে, ও-মা, ও-মা, ও-মা।

বাচ্চাটিকে নিয়ে, ঝুমুর গাড়ীর কাছে আসতেই যশোদা ছেলেটিকে নিয়ে বলে এ কে-গো ?

যশোদা ওর মা ঘরে গিয়েছে আমি ওকে নিয়ে এলাম পালন ক'রবো বলে। দিদিমা এখানে টাকা দিয়ে অনেক পুণ্যি করেছেন। আমি ওকে এনে পুণ্যি করলাম।

ছেলেটা কিন্তু দেখতে বেশ নয় ? তা কি জাত জেনে এসেছ ?

ঝুমুর একটু হেসে বলে জেনেছি ব্রাহ্মণ। ভাবছি ঝোঁকের-মাথায় তো নিয়ে এলাম মোক্ষদা, মাসী আবার রাগ না করে।

রাগ করবে কেন ? আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে কত জনে মানুষ করে, আর এতো ব্রাহ্মণ সন্তান।

যশোদার কথা শুনে ঝুমুর একটু হাসে, কোন উত্তর করে না।

যশোদা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে থাকে, আরো দু'একটা জায়গা সেরে ঝুমুর বাড়ী ফিরে আসে। শিশুটিকে নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। মোক্ষদা ব্রাহ্মণের ছেলে শুনে খুশী হয়ে বল্লে, ভালই হ'লো ছেলে সেয়ানা হয়ে সব বুঝে সুঝে নেবে। আমাদের বউমা টাকা পয়সার ব্যাপারে বড় উদাসীন।

সাত দিন পরের কথা, মহাসমারোহে দিদিমার শ্রাদ্ধের কাজ সুরু হয়। ঝুমুর নিজে শুদ্ধ বস্ত্র পরে দিদিমার শ্রাদ্ধ-শান্তি করে, গোধন; চন্দন, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, আসন, পালঙ্ক ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের দান করা হয়। পরের দিন কুটুম্ব ও শ্মশানবন্ধু বিদায়। ঝুমুর সরকার মশায়কে সমস্ত লিষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে, পরিশ্রান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে যশোদা ওর হাত পা টিপে দেয়।

বিভূতি সেই যে জিদের মাথায় বাড়ী ছেড়েছে, আজ পর্য্যন্ত এ বাড়ী আসেনি। ঝুমুর আজ দুদিন ধ'রে লোক পাঠিয়ে বিফল-কাম হয়েছে সরকার মশায় শেষবার নিজে গিয়েছিলেন, তাঁর মতে, বিভূতি বাড়ীতে থেকে নিজেই বলছে, "দেখা হবে না, বিভূতি বাবু বাড়ীতে নেই।" এমন কি সন্ধ্যে বেলায় শ্মশান বন্ধু হিসাবেও সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। শ্মশান বন্ধুদের ভীড় দেখে ঝুমুর যশোদাকে বলে—,যশোদা দিদিমা কি পলিটিক্যাল লিডাব ছিলেন, এত লোক ওঁর সাথে শ্মশানে গিয়েছিল।

তা আর যাবে না, কত জায়গায় উনি চাঁদা দিতেন, খবব পেয়ে তাঁরাও তো এসেছিলেন।

নীচের বড় হল ঘরে কম করে দু'শ লোকের পাতা পড়েছে, আর হোগলা ঘেরা বিরাট ছাদে শ তিনেক লোকের আসন পড়েছে।

সে দিন খাটতে খাটতে মোক্ষদার হাড় পাঁজর ভেঙ্গে যাবার অবস্থা, মোক্ষদা নীচু থেকে একবার হাঁক ছেড়ে বলে—

কই গো বউমা একবার নীচে এস, দিদিমার অন্তিম কাজের

বন্ধুদের খাবার সামনে একবার দাঁড়াবে না। সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন হলে আমি বা একা চালাই কি করে।

মোক্ষদার ধমক খেয়ে ঝুমুর তর তর করে নীচে নামতে থাকে প্রায় অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় হল ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় গলবস্ত্র হয়ে।

কিন্তু! ঝুমুর চোখ ছুটো ভ।ল করে রগড়ে নেয়, পরিষ্কার ক'রে তাকায়, না, বেশী দিনের তো কথা নয়। বড় জোর চার বৎসর এর ভেতরে এত ভুল হ'য়ে যাবে। আর মানুষের মধ্যে কি এতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু এত লোকের সামনে মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পায় না।

মণ্টু পেতলের জগের পানীয় মাটির গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে, ঝুমুর ডাকে—,

মণ্টু এদিকে একটু শোন তো ?

মণ্টু বাইরে আসতেই ঝুমুর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, তুমি যে লাইনে জল দিচ্ছ সেই লাইনের এগারো নম্বরের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করতো, ওঁর বাড়ী কি দেবলপুরে ?

মণ্টু জানালা দিয়ে এক, ছুই, তিন ক'রে গুনে বলে সাদা পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, রিষ্ট-ওয়াচ, প্লাসটিক ব্যাণ্ড ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বুঝেছ, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করো !

মণ্টু জল দিতে গিয়ে পরামর্শ মত কাজ করে, ভদ্রলোকটি হেসে বলেন, হ্যাঁ আমি ওঁকে চিনেও চিনতে পারছি না, ওঁকে গিয়ে বল, উনি ঠিকই বুঝেছেন।

মোক্ষদা আর একবার হাঁক দিয়ে বলে, "বলি অ-বউমা, নীচে থাকলেই চ'লবে নাকি একবার ওপরে যাও, ছাদেও যে অনেকে ব'সেছেন।"

ঝুমুর কিন্তু এইবার ভারী বিরক্তি বোধ করে। একটু দূরে গিয়ে, ঠিক কঙ্কনের সোজা দাঁড়িয়ে আঙ্গুলে নেড়ে বিদায় জানায়। কঙ্কনও সে ইঙ্গিতে সাড়া দেয়।

ছাদে গিয়ে ঝুমুর বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, একটু পরেই নেমে আসে, ঝুমুর ঘরের ভেতর উকি দিয়ে দেখে, হ'ল ঘরের পাতে তখন মিষ্টি পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, ওরা পান হাতে উঠে পড়ে, হাত ধোবার জন্য, আর কঙ্কন, নেবু দিয়ে হাত কচলিয়ে গ্লাসে হাত ডুবিয়ে, রুমালে হাতটা মুছে নেয়।

ঘরটা তখন ফাঁকা, ঝুমুর ওপাশের জানালার শিকে মুখ লাগিয়ে ডাকে।

'শুনুন'

কঙ্কন জানালার কাছে এগিয়ে আসে।

"হঠাৎ এ বাড়ীতে এলেন কি করে" ঝুমুর প্রশ্ন করে।

কেন নিমন্ত্রিত হ'য়ে।

আপনি কি দিদিমার অসুখে রোজই আসতেন ?

না ক্লাবের ছেলেরা আসতো, আমি শেষের দিন এসেছিলাম। তাতো হ'লো কিন্তু এই বয়সে যোগীনী সেজেছেন কেন, একেবারে গেরুয়া রং।

না, না, গেরুয়া নয়। ও শাড়ীটার রংই অমনি।

তা বেশ, আপনার পতি দেবতাকে তো দেখলাম না ?

ঝুমুর একথার কোন উত্তর দেয় না।

কঙ্কন উত্তরের প্রত্যাশা না করে বলে, কাল এসে আলাপ করবো। শুনলাম আসছে কাল আপনার এখানে বিরাট ব্যাপার। তিন হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে অন্ন বস্ত্রে আপ্যায়ন করছেন। ভেবেছিলাম আসব না। ক্লাবের ছেলেদের পাঠাব কিন্তু এখন দেখছি আসতেই হবে! বিশেষ করে কাজটা যখন আপনার।

কঙ্কন কথা ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা করে না, ক্লাবের দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ঝুমুর ওর যাবার পথে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ক্লাবের তুই একটি ছেলে বলে, ওর সাথে কি আপনার আগে থেকে পরিচয় ছিল ?

তা একটু ছিল। তবে উনি যে এ বাড়ীর বধু তা জানা ছিল না।

এবৎসর ক্লাবের চাঁদা আরো বেশী পাওয়া যেতে পারে হয়তো।

—সম্ভাবনা কম, পরিচিত না হলে হয়তো বেশী কিছু. আদায় করা যেতো কিন্তু এখন আদত চাঁদাই না বাদ পড়ে যায় তাই ভাবছি

... ...

পরের দিন বেলা দশটা থেকে দরিদ্র-নারায়ণ বিদায় সুরু হয়। মোক্ষদা ঝুমুরকে ডেকে বলে বউমা মিষ্টির ভিয়ানের ঘরে তুমি একটু বসো গিয়ে।

ঝুমুর একটু দ্বিধাভরে বলে, "ওসব তুমিই দেখ না মাসী, আমি ছাদের ওপর থেকে একটু দরিদ্র বিদায় দেখি।"

যশোদা কাজের ভয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ছেলে কোলে বসে থাকে, তাকে তো কিছু বলবার উপায় নেই। তিনি তো গোপাল কোলে মা যশোমতী। তুমি কি ভিয়ানটাও দেখবে না?

মোক্ষদার বিরক্তিতে ভয় পেয়ে ঝুমুর ভিয়ানের ঘরে চেয়ার পেতে বসে।

মণ্টু হন্ত দন্ত হয়ে ভিয়ানের ঘরে ঢুকে বলে—বউদি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে উঠেছি, আর তুমি কিনা ছোট ছেলেদের মত মিষ্টির ঘরে ঢুকে চুপ চাপ বসে আছ।

কি করবো বল পাঁঠার ইচ্ছেয় তো ঘাড়ে কোপ নয়। মোক্ষদা মাসীর অর্ডার।

তাতো বুঝলাম; দরবেশ এক সাথে কতটা বার করতে হবে বলে দাও, ওদিকে ওঁরা সবাই হ্যা করে দাঁড়িয়ে আছেন।

—"কারা হ্যা করে দাঁড়িয়ে আছেন"!

—এত নাম টাম মনে থাকে না বাপু। কালকের সেই ভদ্রলোক সোনার বোতাম, প্লাসটিক ব্যাণ্ড ঐ যে তোমরা হাতে কি পর? চুড়ির সামনে!

—কে কঙ্কন বাবু ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

তা আমি কি করবো বল, অন্ধকার ঘরে ঘণ্টা খানেক ধরে ভিয়ান পাহারা দিচ্ছি। তোমরাই তো কেউ আসছ না। যাও এবার ওদের ডেকে নিয়ে এস।

মণ্টু কঙ্কনকে ডেকে আনে। কঙ্কনের কাপড়ের খুঁট শক্ত করে কোমরে বাঁধা—গায়ে একটা আসমানী রংএর হাফসার্ট, খালি পা, হাতে একটা মস্ত বড় পেতলের গামলা—ঘরে ঢুকে ঝুমুরকে বলে এই যে, মিষ্টির মালিক হয়ে বসেছেন দেখছি !

মণ্টু তাড়াতাড়ি এক ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে পরিবেশন করতে যায়, আর কঙ্কন রসগোল্লার রসে হাত ঢুকিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে রসগোল্লা তুলতে থাকে।

ঝুমুর বলে কাজ করলে বুঝি আপনার কথা বলতে নেই।

খুব আছে, বলুন কি কথা বলবো মাসী, পিসি, দাদা বউদি, কি কথা শুনতে চান ?

মাসী, পিসি, দাদা, বউদি এই গুলোই কি শুধু মানুষের কথা।

মানুষের কথা শোনবার অবস্থা আপনার নেই, বলবার অধিকারও আমার নেই।

সব রকম ভালমন্দ কথা শোনবার অবস্থা আমার আছে, বলবার অধিকার আপনার আছে কিনা সেটা আপনি ভেবে দেখুন।

পরে ভেবে দেখবো, আপাততঃ পাপ কাজগুলো সেরে আসি।

পাপ কাজ !

নয় তো কি আপনাদের নাম বিতরণের চেষ্টায় একটু হরিসংকীর্ত্তন করা।

নাম বিতরণের চেষ্টায় হরিসংকীর্ত্তন করা !

নয় তো কি, কতগুলো কুঁদোর মত সমর্থ লোককে পোলাও খাওয়াবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা খরচ !

কিন্তু ওদের কি একটু ভাল মন্দ খাবার অধিকার নেই ? .

খাবার দিচ্ছেন বলবেন না, জিভে একটু ছেঁকা লাগিয়ে দিচ্ছেন বলুন।

তার মানে ?

তার মানে, পায়েস তৈরী হচ্ছে, দেখলাম অল্প দুধে জল ময়দা গুলে, আর পোলাও তৈরী হচ্ছে দালদা দিয়ে, যারা একদিন ভাল খেয়ে পঞ্চাশ বৎসর হাত শুঁকে বেড়াবে, একদিন ভাল খাইয়ে তাদের মস্ত বড় ক্ষতি করা হয়। এর চাইতে ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি খাওয়ালে সে খাওয়াটা ওদের দেহে লাগতো।

কিন্তু দুধের ভেতর ময়দা গুলে দিচ্ছে কারা ?

আপনি নিজে।

আমি !

নিশ্চয়ই, টাকার মালিক হয়ে, টাকার সদ্ব্যবহার কি ভাবে হচ্ছে, যাঁরা দেখেন না, তাঁরাই সব চাইতে বড় চোর। এখন বড্ড তাড়াতাড়ি, মিষ্টিগুলো দিয়ে এসে এ বিষয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো।

ঝুমুরের চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে, কঙ্কন মিষ্টি নিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে যায় !

কিছুক্ষণ পরে মণ্টু ছুটে এসে বলে—বউদি দেখবে এস ভিক্ষুক-গুলো খেয়ে দেয়ে কেমন দুই হাত তুলে তোমার জয় গান করছে।

পেট ভরে খেতে পেয়ে, বাইরের বুভুক্ষু ভিক্ষুকগুলো চীৎকার করে বলছে "জয়, বউরাণীর জয়"।

ঘণ্টা খানেক পরে কঙ্কন ফিরে আসে, কাপড়ের এখানে ওখানে জায়গায় জায়গায় মিষ্টির রস পড়েছে।

কাপড়ের দিকে তাকিয়ে কঙ্কন মুখ বিকৃত করে বলে—আঃ বড় লোকের বাড়ীর মিষ্টি, কাপড়টাও লেপটে চেপটে খেয়েছে।

হ্যাঁ বড় লোকের বাড়ীর ব্যাপারে কাজের লোকের অভাব হয় না দেখছি।

কথাটা অনেকটা ঠিক বলেছেন, তবে এও ঠিক, টাকা দিয়ে মানুষ কেনা যায় না।

কে বললে টাকা দিয়ে মানুষ কিনতে পাওয়া যায় না, এদেশে টাকা দিলে সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু থাক সে কথা, ঈশ্বরের অনেক আশীর্ব্বাদ, আপনারা অপছন্দ করেছিলেন বলেই, আমি আজ বউরাণী।

আপনারা বলবেন না, ওটা বহুবচনে গিয়ে দাঁড়ায়। এখন ও কথা থাক, আপনার স্বামীর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিন।

ঝুমুর একটু দুঃখের হাসি হাসে। ইতিমধ্যে মণ্টু ব্যস্তবাগীশের মত ঘরে ঢোকে, ওর চোখে মুখে সাত মাতব্বরের মত ভাব।

কঙ্কন মণ্টুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, ওহে খোকা উনি তোমার কে হন

কেন, আমার বউদি।

তা ভাল, তোমার দাদাকে একটু ডেকে দিতে পার, পরিচয় যখন কেউ করিয়ে দেবেন না তখন নিজের থেকে আলাপ করে যাওয়াই ভাল। আমাদের ক্লাবে দুর্গা পূজার সময় এ বাড়ীর লোকেরা উচ্চাঙ্গের চাঁদা দিয়ে থাকেন, কাজকর্ম করে দেখিয়ে যাই যে আপনাদের ব্যাপারে খেটে খুটে গেলাম, দয়া করে চাঁদার অঙ্কটা ঠিক রাখবেন, ছেঁটে ছুঁটে দেবেন না।

তিনি তো এ বাড়ীতে থাকেন না মণ্টু প্রত্যুত্তরে বলে।

থাকেন না!

না বউদি বিয়ের প্রথম দিন ঝগড়া করে—,

ঝুমুর অস্থির হয়ে ধমক দিয়ে বলে মণ্টু……

ঝুমুরের প্রথম আপত্তির আঁখি দেখে মণ্টু কথাটা শেষ না করে পালিয়ে যায়।

কঙ্কন ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বলে—এটা কিন্তু ঠিক হলো না। ও, কথা বলবার আগেই, আপনার ধমক দেওয়া উচিত ছিল। অর্দ্ধেক কথা বলবার পর, ধমক দেবার কোন মানে হলো না। ভাবটা কেমন হলো জানেন, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানী" আমি তো সব কথা বুঝেই নিয়েছি। বিয়ের রাতেই স্বামীর সাথে ঝগড়া করে এবাড়ীতে চলে এসেছেন এই তো ?

শূন্য ঘর পেয়ে ঝুমুর বলে,—দেখুন অন্ধকে অন্ধ বললে সে ব্যথা পায়।

জানি—আপনার মত সুন্দর বুদ্ধিমতী মেয়ে স্বামীর ঘর থেকে চ'লে আসবার কোন অর্থ বুঝলাম না। আপনার স্বামী কি চিররুগ্ন অথবা স্ত্রীর ঘর করতে অপারক।

সে খবর আমি রাখিনে।

ও তার ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি সিঁদুর পরা কুমারী, স্বামীর ঘর করেন না কিন্তু এ বাড়ীর সম্পত্তির মালিক হ'লেন কি ক'রে, স্বামীর সাথে সম্পর্ক নেই কিন্তু বউরাণীর তকমাটা তো ঠিক রেখেছেন, শাঁখা সিঁদুরের রাঙ্গা প্রহসনের ধাক্কাটা বুঝি সামলে উঠতে পারেন নি ? অথবা স্বামীর ঘর না করাটা আপনাদের একটা ষ্টাইল, বিশেষ করে আজকালকার দিনে।

হয়তো তাই হবে। কিন্তু আমার স্বামী সম্বন্ধে আপনি বা এত সচেতন হ'য়ে উঠলেন কেন ? আমার মনে হয় এটা আপনার সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা।

আজকালকার বাজারে অনধিকার চর্চ্চাই বটে, পুলিশের চোর না ধরা, দেশ নেতার গান্ধী টুপি পরা, স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর না করা, সবই মহানুভবতা, একটা হচ্ছে অহিংসা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ঐতিহ্য আর তৃতীয়টা হচ্ছে নিষ্কাম। এ সব মিলিয়েই বর্ত্তমানের কৃষ্টি আর সৃষ্টি।

ঝুমুরের মুখ তখন অপমানের আঘাতে লাল হয়ে উঠেছে,

বিশেষ অপ্রসন্ন হয়ে ও উত্তর করে আপনি মঞ্চে উঠে কেন বক্তৃতা করেন না, তা হলে অনেকগুলো মালা পেতেন আর তা ছাড়া আপনার চৌদ্দ গুষ্ঠী যে সেখানে আছে, সংবাদ পত্রের ছত্রে ছত্রে তাদের নাম আর ছবি উঠতো। কেন না মানুষ হিসাবে যতই হীন হন না কেন বক্তৃতা করবার সদ্‌গুণ আপনার আছে।

বুঝেছি, যে কুমোর আপনাকে গড়েছিল কাঠামটা সে ভালই করেছিল, কিন্তু হাতের ত্রিশূলটা নীচু দিকে না দিয়ে ভুল ক'রে উঁচু দিকে দিয়ে দিয়েছে, আপনি ভাঙ্গতে পারবেন ভাল করেই, কিন্তু গড়তে কিছু পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

ঝুমুর কথার তীর সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কঙ্কন হাত ধুয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে, দল বল নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

দিদিমার সমস্ত ব্যাপারই ভালোয় ভালোয় মিটে যায়, লোক জন আত্মীয় স্বজন একে একে সবাই বিদায় নেয়, সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে ছোট্ট ছেলেটা ওয়াঁ ওয়াঁ করে কেঁদে উঠে বাড়ীর থমথমে ভাবটা কাটিয়ে দেয়।

ঝুমুর প্রকাশ্যেই পড়াশুনা সুরু করে। মোক্ষদাকে বলে সমস্ত জীবনটা নিয়ে কি আর ক'রবো মাসী, লেখা পড়াটাই করি।

মোক্ষদা ঝুমুরের লেখা পড়ায় আপত্তি করে না, চতুর মোক্ষদা একথা বেশ বুঝতে পারে যে ঝুমুর সংসারী হ'লে তার কর্ত্তৃত্ব নাও থাকতে পারে। তাই ও ঝুমুরকে সংসারে বিশেষ ভিড়তে দেয় না, ঝুমুর এখন একটা সহজ আর স্বাধীন জীবনের অধিকার পায়।

সে দিন দোতলার বারান্দায় ঝুমুর দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তা দিয়ে কঙ্কন সাইকেলে বেল বাজিয়ে পথচারীদের সতর্ক করে চলে যায়, কঙ্কন ঝুমুরকে দেখেও দেখে না, এ অবহেলায় ঝুমুর বিশেষ আহত হ'য়ে রাত্রে খাবারের পাতেই বসে না। মোক্ষদাকে বলে শরীরটা

বিশেষ ভাল নেই মাসী, রাত্রে কিছুই খাব না। সমস্ত রাত ঝুমুরের ভাল ঘুম হয় না, এপাশ ওপাশ করে কাটায়।

পাশের ঘরে ছেলেটা যশোদার কোলের কাছে শুয়ে হঠাৎ কেঁদে ওঠে। যশোদা চিরকাল ঘুম কাতুরে ওর ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। ঝুমুর উঠে গিয়ে ওর মুখ থেকে পড়ে যাওয়া চুষিটা আবার ওর মুখে লাগিয়ে দেয়। শান্তিতে হোক আর অশান্তিতেই হোক যা হোক করে রাতটা কেটে যায়। ভোর বেলায় উঠে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে দাঁড়াতেই দেখে কঙ্কন একদল ছেলের সাথে কোথায় যাচ্ছে, কঙ্কন ওপর দিকে একবার তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নেয়। ঝুমুর যশোদাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, এত ভোরে দল বেঁধে ওরা কোথায় যায় রে ?

ও হরি তাও তুমি জান না, যায় চৌধুরীদের বাড়ীতে সাঁতার কাটতে।

ওরা বুঝি রোজ যায় ?

হাঁ রোজ যায়।

ওরা ফিরবে কখন ?

এই ঘণ্টাখানেক বাদে।

শোন যশোদা, কঙ্কন বাবু নামে একজন ভদ্রলোক ওদের মধ্যে আছেন। এই পথ দিয়ে যখন ওরা আবার ফিরে যাবে, তখন একবার ঐ ভদ্রলোকটিকে ডেকে দিতে পারবি, দিদিমা নাকি ওঁদের ক্লাবে চাঁদা দিতেন। কিন্তু কই তু'মাসের মধ্যে তো ওরা আমার কাছে চাঁদা চাইতে এলো না।

দেবো ডেকে যশোদা উত্তর করে। ঝুমুর তাড়াতাড়ি এত ভোরে স্নান সেরে নেয়। বেছে বেছে একখানা ভাল শাড়ী পরে, মুখে পাউডার মাখে, হাতে ঘড়ি বাঁধতেও ভোলে না। ঘণ্টাখানেক বাদে যশোদা কঙ্কনকে ডেকে আনে, খবর শুনে ঝুমুর নীচে নেমে এসে বলে।

—সেদিন এতগুলো বিষ ছড়িয়ে গেলেন বিষের জ্বালায় মানুষটা মলো না বাঁচলো একবার তো খবর নিতে এলেন না।

বিষের জ্বালা দেখতে আসা ওঝার কাজ আমার নয়। ভাবছি এই পথে হাঁটা আমায় ছেড়েই দিতে হবে। এবাড়ীর বধূকে রোজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবার দৃশ্যটা পাঁচজনের চোখে খুব শোভন নাও লাগতে পারে। অন্ততঃ আমার চোখে তো লাগে না।

ঝুমুর আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে মুখর হয়ে উঠে, বলে—পথের লোক সবাই আপনার দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে না, আমি যদি বলি আপনার নিজের সহজ দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে অবিরত অপর পক্ষকে আঘাত করছেন, তাতে কি ভুল হবে? কি করে ভাবতে পারেন যে পৃথিবীর সমস্ত প্রতীক্ষা আপনার পথ চেয়েই বসে আছে, আপনি ভাবছেন আপনার কথার ইঙ্গিত কেউ বুঝতে পারে না।

—এই বুঝতে পারাটাই আমি চাইছিলাম তা ছাড়া, আজ ঝিকে দিয়ে কাল চাকরকে দিয়ে রোজ রোজ ডেকে পাঠানোটা খুব শোভন কি? আপনার ভালর জন্যই বলছি, কেননা, সামাজিক জীবনের প্রথম কথাটাই আপনার জীবনে লাল কালিতে আনডারলাইন হয়ে আছে। খুব কম অপরাধে দাগী চোরের বদনাম নেওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি?

থাক আমার মঙ্গল আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। জীবনের প্রথম কথাটাই লাল কালিতে আনডারলাইনড হয়ে আছে, আর আমি যদি বলি আপনাদের বোঝবার ভুলে, বিচারের ভুলে, সবুজ কালিতে "এসটারিক" মার্ক করা জীবনগুলো লাল কালিতে আনডারলাইনড হচ্ছে। আর লাল কালিতে আনডার লাইন করা জীবনগুলো সবুজ কালির এসটারিক সাইন নিয়ে, আপনাদের বাহবা পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

জীবন দর্শন করা সাধকের কাজ আর সাধারণ জীবনের খুঁটিনাটি দেখাটা সমাজের কাজ। খুব বড় কাজ যাঁরা করেন তারাও সমাজকে চান না খুব ছোট কাজ যারা করে তারাও সমাজকে চায় না। সাধারণ পন্থীরাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। আচ্ছা এখন ওসব কথা

থাক, কই বড় লোকের বাড়ী এলাম পেট ভরে খাব বলে, এক পেয়ালা চাও তো দিলেন না।

ঝুমুর অপ্রস্তুত হয়ে বলে, এই বিষ্টু চা আর খাবার এনে দে তো দাদাবাবুকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ট্রেতে করে চা আর খাবার নিয়ে আসে ভৃত্য পান্না। এ বাড়ীর জল খাবারের দায়িত্ব ওরই হাতে চিরকাল।

ঝুমুর প্লেটগুলো ট্রে থেকে নামিয়ে কঙ্কনের সামনে দেয়।

কঙ্কন প্লেটটা এগিয়ে ধরে বলে "হাফা-হাফি"।

ঝুমুরের চোখ দিয়ে এতক্ষণ পরে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

কঙ্কন উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বাইরের দিকটা একবার দেখে নিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ কি হচ্ছে ঝি চাকরেরা দেখে ফেললে কি ভাববে বলুন তো? বেশ আপনি কাঁদুন আমি চললাম।

ঝুমুর শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে।

কঙ্কন বলে—আচ্ছা প্রীতি বা বন্ধুত্বের ব্যাপার নিয়ে একটা লটারি হোক, চোখ বুজে আপনিও খাবার তুলুন, আমিও তুলি, যদি দুজনেই এক জিনিস তুলি, তবে চিরদিনের সখ্যতাকে মেনে নেবো, কিন্তু চোখ পিট পিট করলে হবে না।

ঝুমুর সত্যি সত্যি চোখ বুজে কঙ্কনের প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নেয়। আর কঙ্কন সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আর একটি সন্দেশ তুলে নেয়।

—দেখি আপনি কি তুলেছেন?

ঝুমুর মুঠো খুলে কঙ্কনকে সন্দেশ দেখায়। কঙ্কন নিজের হাতের সন্দেশটা ঝুমুরের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, হয়েছে এবার। খুসী তো?

আপনি কি সত্যি সত্যি চোখ বুজে সন্দেশ তুলেছেন, ঝুমুর জিজ্ঞাসা করে।

আমি আপনার এখানে এসে সব সময় চোখ বুজে থাকি। চোখ খুলে তাকালেই মুশকিল। চোখ বুজে থাকলে চাল নৈবিদ্যের আশা আছে, চোখ খুললেই বিপদ। অনেক বকালাম এইবার উঠি।

ঝুমুরও উঠে দাঁড়ায়।

কঙ্কন বলে, "জিজ্ঞেস করলেন না কবে আবার আসব।"

আমি ভিক্ষুক নই, বাবু দাও বলে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকবো।

কঙ্কন বলে, ভাল তবে নিজেই বলে যাই শনিবার দিন আবার আসব।

ঝুমুর বলে দিদিমার নামে একটা উৎকট শিশু আশ্রমকে ভাল ভাবে সংস্কার করে জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গ করবো। আপনারা সবাই সাহায্য করলে, জিনিসটা খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে।

চৎমকার কথা। আমরা খেটে-খুটে নিশ্চয়ই আপনার শুভ ইচ্ছাকে সফলকাম করে তুলবো।

আমি আপনাকে সব ভেতরের খবর বলবো। আপনি জায়গাটা দেখে এসে, এটাকে সত্যিকারের ভাল ভাবে গড়ে তুলতে কি জাতীয় খরচা লাগে জানালে এসটিমেট মত ষ্টেট থেকে টাকা দেবো।

বেশতো আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা কাজে লেগে দেখিয়ে দেবো চেষ্টা করলে কত অল্প সময়ে কত বড় জিনিস গড়ে তোলা যায়। কঙ্কন বিদায় নিয়ে চলে যায়।

কঙ্কন চলে যাবার পর, ঝুমুর অনেকক্ষণ বসে কি ভাবে, তারপর শোবার ঘরে ঢুকে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে।

যশোদা বলে অসময় শুলে কেন বউদি, শরীরটা কি ভাল লাগছে না?

শরীর ভালই আছে, খুব ভোরে উঠেছি কিনা তাই চোখটা জ্বলছে।

ছোট্ট ছেলেটাকে ঝুমুরের পাশে শুইয়ে দিয়ে বলে, ছেলেটার জন্য ভাল করে মুখ ধোবারও উপায় নেই। বউদি ওকে একটু দেখ না।

আচ্ছা তুই যা, আমি ওকে খেলা দিচ্ছি ঝুমুর খোকার তুলতুলো গালে চুমু দিয়ে বলে—.

"ছিলি আমার পুতুল খেলায়
প্রভাতে শিব পূজার বেলায়
ইচ্ছে হয়েছিল মনের মাঝারে"

খোকা বাড়ীতে ঢোকবার পর খোকাকে আদর করা ঝুমুরের এই প্রথম।

এক মাস পরের কথা, ম্যাট্রিকের ফল বেরিয়েছে, ঝুমুর আর মন্টু দু'জনেই পাশ করেছে, ধেনো অভিনন্দন জানিয়ে ঝুমুরকে চিঠি দিয়েছে, এবং আরো পড়বার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। আর একটা কথাও ধেনো লিখেছে—

আসছে মাসে আমার বিয়ে পাত্রী পছন্দ করেছেন মা বাবা, সুতরাং বিয়ে দেশেই হবে। তোমাকে নিয়ে যাবাব ইচ্ছে খুব বেশী ছিল কিন্তু আমি জানি দেশে যেতে তুমি আপত্তি করবে। গেলে কিন্তু ভালই হতো, দেশের মানুষের ভুল কিছুটা ভেঙ্গে যেত, অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিয়েছি, ফিরে এসে তোমার সাথে দেখা করবো।

তোমার অনাথ আশ্রম খোলার সংবাদ কাগজে দেখে ভীষণ সুখী হলাম। তোমার ছোট বেলার স্বপ্ন এতদিনে সফল হয়েছে। মনে আছে ছোট বেলায় কি বলেছিলে, "পরসেবাব্রত" তোমার মহান আদর্শ হবে, মনে মনে তাই ভাবছি তোমার জীবনটা হয়তো ঈশ্বরের অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ, আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিও, আমার প্রীতি জেনো। ইতি—

তোমার
ধেনো দা

খেনোর বিয়ে! ঝুমুর চিঠিটা এপিঠ ওপিঠ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। রাহুল বৈজ্ঞানিক আজ হয়তো সত্যি বিদেশ যাচ্ছে, আর প্রাণা…! মোক্ষদার ডাক শুনে ওর চিন্তা থমকে দাঁড়ায়।

বউমা, পাড়ার ছেলেরা আখড়ার জন্য চাঁদা চাইতে এসেছে।

ঝুমুর নীচে এসে দেখে, কঙ্কন চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার আশেপাশে আরো দু'চারটা ছেলে।

ওদের দেখে ঝুমুর হেসে বলে,—আমি যদি দিদিমা হতাম আপনাদের এক পয়সাও চাঁদা দিতাম না।

পাশের ছেলেটি বলে, চাঁদা দেওয়া না দেওয়ার ভার আপনার হাতে, আপনি ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারেন।

না, সে ক্ষমতা আমার নেই, কেননা দিদিমা চাঁদার কথাটাও উইলে লিখে গিয়েছেন

উইলে থাক আর না থাক সেটা আমাদের প্রশ্ন নয়, আপনি কেন চাঁদা বন্ধ করতে চাইছেন সেইটাই আমাদের প্রশ্ন।

পেশী ফুলিয়ে দু'বেলা রাজপথ দিয়ে হাঁটা ভিন্ন আপনাদেব দ্বারা জাগতিক উপকার কিছু হয় না।

কঙ্কন তখন খাতার পাতা উল্‌টিয়ে দিদিমার নাম ধাম খুঁজে বেড়াচ্ছে, ঝুমুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, এই পেশী গুলো যতক্ষণ পরমাত্মার পরিচয় ততক্ষণ। হ্যাঁ জাগতিক উপকারের কথা কি বলেছিলেন, এই সেদিন এত বড় খাওয়া দাওয়ার রাজসূয় যজ্ঞটা পাড়ার ছেলেরাই এক রকম করে দিয়ে গেল। এর মধ্যেই বলছেন উপকার হয় না?

আমার অনাথ আশ্রমের কাজ এখনো তো শেষ হয়ে উঠলো না, চোরাবালু সামাজিক জীবনের তলা খেয়ে দিচ্ছে, সেদিকে তো আপনাদের কারো দৃষ্টি নেই।

এক মাসে এত বড় ভুতুড়ে বাড়ী সম্পূর্ণ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বাড়ীটা এখন দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না,

নার্স রাখা হয়েছে দু'টি, দু'টি ডাক্তার, চারটি চাকর, তিনটি মেথর। আরো মাস খানেক বাদে আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখাবো, তখন আপনি একশ বার একথা স্বীকার করবেন যে আখড়ার ছেলেরা সত্যি সত্যি কর্ম্মঠ।

কঙ্কন খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নিন সইটা চট করে করে দিন তো, কঙ্কন ঝুমুরের হাতে কলম তুলে দেয়।

নাম সই করে, ঝুমুর ওদের বাৎসরিক চাঁদা মিটিয়ে দেয়। ওরা সবাই হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে চলে যায়।

তিন মাস পরের কথা ঝুমুর আই, এ, পড়ছে অপার উৎসাহ নিয়ে। সেদিন ঝুমুরের মনটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, ও মোক্ষদাকে বলে, মাসী, গঙ্গার ধারে গাড়ী নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। আর যদি সম্ভব হয়, আমার বাবার সংবাদটা একবার নিয়ে আসি ধেনোর ওখান থেকে।

মোক্ষদা মনের আপত্তি মুখে প্রকাশ করে না। সে ভাল ভাবেই বোঝে, বউমা একটা পাশ দিয়েছে, আবার আর একটা পাশ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ী বার করে বরাবর মতিশীল ষ্ট্রীটে যায়, তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, ঝুমুরের গায়ে অল্প অল্প করে বৃষ্টির ছিটে লাগতে থাকে, ও ইচ্ছে করেই জানলার কাঁচটা তুলে দেয় না। অল্প অল্প বৃষ্টির ছিটে ওর সূক্ষ্ম অনুভূতির তন্ত্রীগুলোকে চঞ্চল করে তোলে।

যথা সময় ....নম্বর মতি-শীল ষ্ট্রীটে গাড়ী এসে দাঁড়ায়, ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই ঝুমুর গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। ধেনোর ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে দেখে, বরাবর ঝুমুর ওপরে উঠতে থাকে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঝুমুর একটু থমকে দাঁড়ায়। ঝুমুর দেখে ধেনোর বউ খাটের ওপর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর ধেনো বউয়ের পেটে সুরসুরি দিয়ে বলছে, আর দুষ্টুমি করবে? ঝুমুর পাঁচ সেকেণ্ড

দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, দরজার কোণে দাঁড়িয়ে করা নাড়তে থাকে। ধেনোর বউ কাপড় চোপড় ঠিক করে ভবা হয়ে বসে, আর ধেনো শব্দ শুনে এগিয়ে এসে, ঝুমুরকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বউকে ডেকে বলে—মধু দেখে যাও কে এসেছে, ধেনো ঝুমুরের হাত ধরে টেনে ওকে ভেতবে আনে। তারপর অনুযোগের সুরে বলে—ধেনোর ঘরে ঢুকতে তোমার এতখানি দ্বিধা করা উচিত নয়।

ধেনোর বউ হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে, কিন্তু দরজার সামনে এগিয়ে এসেই ভূত দেখে চমকে ওঠার মত চমকে ওঠে।

ঝুমুর ওর দিকে অপলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

ধেনো ঝুমুরকে বলে, পরিচয় করাবার কোন দরকার নেই। বিয়ের প্রথম রাত্রেই আমি মধুকে তোমার কথা বলেছি, আর এও বলেছি, আমি তোমায় মৌমাছি বলে ডাকি। তবুও ওদের দুজনকে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধেনো বলে—ও, বুঝেছি, যতই যে উদার হও, মেয়েছেলে দ্বিতীয় কোন মেয়েছেলেকে সহ্য করতে পারে না। এদের মনের প্যাঁচ চিরন্তনী।

ঝুমুর চোখ ফিরিয়ে ধেনোকে গিয়ে বলে—,তুমি ঠিকই বলেছ, বোধ হয় তাই হবে।

সমস্যার সমাধান পরে ক'রো এখন প্রথম দিনে একটু ভাব করে নাও। বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি এক ছুটে মৌমাছির জন্য খাবার আনছি, তোমরা ততক্ষণ কথা বল। ধেনো বাইরে বেরিয়ে যায়।

নিদারুণ নিস্তব্ধতা ঝুমুরই প্রথমে ভাঙ্গে, নিজের মনের সন্দেহ ঠিক কিনা দেখবার জন্য, নব বধূর হাত উলটিয়ে উল্কিটা একবার দেখে দেয়, তারপর বলে—আশ্চর্য বটে, তুমিই ধেনোর বউ, আর তোমাকে ধেনোর মা বাবা পুত্রবধূ হিসাবে নির্ব্বাচন করেছেন।

নব বধূ একেবারে ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে,

স্বামীর মুখে শুনেছি তুমি এক সময় ওর পরম বন্ধু ছিলে। শুধু সেই পবিত্র সম্পর্ক স্মরণ করে আমার অতীতের মহা ভুলকে প্রকাশ করে আমার আনন্দের সংসারে ঘুণ ধরিয়ে দিও না।

আর একদিনও তোমাকে এমনি কাঁদতেই দেখেছিলাম, শিশু সন্তানের জন্য কী তোমার বেদনা. আর আজ কী তীব্র আনন্দের মধ্যেই না স্বামীর ঘর করছ। কি করে তোমরা এমন সুনিপুন অভিনয় করতে পার আমি ভাবতে পারি না।

অভিনয় নয় আমি সত্যি সত্যি আমার স্বামীকে ভালবাসি।

একটা সত্য কথার উত্তর দেবে ?

আজ আমি তোমার কাছে সব সত্য বলবো।

আজ যদি ধেনোর সন্তান তোমার গর্ভে হয়, তুমি তাকে পিঁপড়ে দিয়ে ইঁদুর দিয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে পার ?

না ? মধু উত্তর করে।

আর একটি সন্তানকে কি করে পেরেছিলে ?

সন্তানের জন্ম দিয়ে যে পিতা দায়িত্ব নিতে চান না যে পিতা পরিচয় দিতে চান না, কোন স্ত্রীলোকের চোখেই তিনি স্বামীর আসন পেতে পারেন না, তিনি তখন পুরুষ বলেই শুধু গণ্য হয়ে থাকেন। স্ত্রীলোকের একান্ত আকাঙ্খাই একাধিপত্যতার দাবী। যে সন্তানটিকে আমি মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে এসেছি, তার মৃত্যুই ছিল একান্ত প্রয়োজন, কেন না তার জনক তাকেও গ্রহণ করতো না আমাকেও না, পুরুষের সৎসাহস আর সত্যনিষ্ঠার অভাবেই পাপ তার প্রভাব বিস্তার করে, আমার বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছে।

তোমার সন্তানের কথা তোমার কখনো কি মনে হয় না।

হয়, কিন্তু কোন উপায় না দেখে কুন্তির ন্যায় তাকে তার প্রতিদিনের পরমায়ুর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

এই দীর্ঘ বয়স পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল মাতৃত্বের মত এত মহান এত মধুর এত স্বার্থহীন সম্পর্ক বুঝি কিছুই নেই। এখন

দেখছি সামাজিক মাতৃত্বই আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে, এর ভেতরেও সত্যতার অভাব। আচ্ছা তাকে কি দেখতে ইচ্ছেও তোমার হয় না ?

না; তাকে গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই তাই দেখে আর দুঃখ পেতে চাই না।

তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন, ঝুমুর হঠাৎ খেই ছাড়া প্রশ্ন করে বসে।

মধু মুখ নীচু করে বলে—তোমার কাছে বলতে আমার বাধে।

কেন!

আমি তোমার সমস্ত কথাই ওঁর মুখ থেকে শুনেছি, তোমার সংযমী চিত্তের সামনে এত গভীর ভালবাসার কথা শুনলে তুমি ব্যথা পাবে, তাই আমার কথা তোমার না শোনাই ভাল।

ঝুমুরের মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে কিন্তু সে ভাবকে কাটিয়ে নিয়ে বলে—বলতে পার বিয়ের রাত্রেই খেনো কেন আমার কথা তোমায় বলেছিল।

তেমন কিছুই নয়, বলছিলেন আজকাল বড় বড় বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়, বিয়ের পর উভয় পক্ষের প্রশ্ন করার অনেক কিছু থাকতে পারে। তাই কথায় কথায় তোমার কথা উঠেছিল।

ও তো তোমার কাছে সব সত্য বলেছে তুমি তোমার জীবনের এক বিন্দুও বলনি।

না, আমাকে প্রথম থেকেই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে, সত্যের আশ্রয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষায়। যেমন মিথ্যে পরিচয় দিয়ে কর্ণ ভৃগুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিপুলত্ব অর্জ্জন করবার জন্য।

কিন্তু এই মিথ্যের অপরাধের জন্যই কর্ণ অভিশাপে জর্জ্জরিত হয়েছিলেন।

না, তুমি ভুল করলে, কর্ণ সত্যি সত্যি সূর্য পুত্র এবং কুন্তির নন্দন, একথা সর্ব্বজ্ঞ ভৃগু নিশ্চয়ই জানতেন, এখানে বরঞ্চ উল্টো

কথা বল, যে কর্ণের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষাই কর্ণকে মৃত্যুর পথে টেনে এনেছিল, কর্ণ যদি সত্যিই সূত পুত্র হতেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষাও হতো সাধারণ। ক্ষত্রিয় তেজ তাঁর একেবারেই থাকতো না, তিনি জীবনের সত্যতার জন্য দণ্ড পেয়েছেন মিথ্যার জন্য নয়।*

—তবে কি তুমি বলতে চাও সত্যাশ্রয়ী চিরকাল দুঃখ পেয়ে থাকেন।

—অনেকটা তাই!

ঝুমুর ওর কথা শুনে ওর মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে।

মধু আবার বলতে থাকে, আমার জীবনের কথা শুনলে আমি জানি আমার স্বামী আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে ক্ষমার দণ্ড আমায় বড় জ্বালা দেবে। কোন দিন প্রাণ খুলে বলতে পারবো না "আমি তোমায় ভালবাসি" চোরের মত ভালবাসার ঘর করতে হবে।

ভয় নেই তোমার স্বামী ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না। তুমি পরম নিশ্চিন্তে এখানে বাস করতে পার।

ইতিমধ্যে ধেনো এসে পড়ে, মধুর কিন্তু আড়ষ্ট ভাবটা তখনও ঠিক কাটেনি, ঝুমুর অনেক আবোল তাবোল হাসি ঠাট্টার মাঝে জিনিসটাকে সরল করবার চেষ্টা করে।

মধু উঠে প্লেটে খাবার সাজিয়ে, চা তৈরী করে, তারপর তিনজনে বসে চা আর খাবার খায়। রাত্রি তখন আটটা। বৃষ্টিটা মাঝখানে ধরে এসেছিল আবার নামতে সুরু করে।

ঝুমুর চঞ্চল হয়ে বলে—বাবারে! এখন বাড়ী না ফিরলে মোক্ষদা আমায় রক্ষা রাখবে না। বৃষ্টিও নামলো জোরে।

ধেনো হেসে বলে গাড়ীর মালিকের বৃষ্টির ভয় কি, বৃষ্টির ভয় আমাদের মত সাধারণের।

ওরা দুজনে ঝুমুরকে গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। মধু ঝুমুরের কানের কাছে মুখ রেখে বলে, বলো না ভাই।

না তোমার কোন ভয় নেই, উত্তরে ঝুমুর বলে।

গাড়ীটা চলতে সুরু করতেই আবার বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে ঝুমুর চোখ বোজে, ড্রাইভারকে বলে—মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটু গঙ্গার ধারে যাব। মনটা ওর কেবলি বলতে থাকে, ধেনোর বউয়ের যদি ভালবাসা পাবার অধিকার থাকে তবে আমার কেন নেই। জেটি বাঁধা ঘাটে গাড়ীটা এসে দাঁড়াতেই ঝুমুর গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। ড্রাইভারকে বলে, পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে যাচ্ছি, দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসব। জলের ভয়ে ঘাটের পারের কলরব আজ একটু কম, বেশ জোরে জোরে বাতাস বইছে, ঝুমুর সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে আপন মনে এগিয়ে চলে। ফিন্‌ফিনে বৃষ্টিতে ওর জামা কাপড় অল্প অল্প ভিজতে সুরু হয়েছে।

পেছন থেকে কে বলে ওঠে—কি সব পাগলামী হচ্ছে, এই বৃষ্টির দিনে এমন সময় একা বেরুতে আছে?

ঝুমুর তাকিয়ে দেখে কঙ্কন।

কঙ্কনের নিজের কাঁধের ওয়াটার প্রুফটা ঝুমুরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বলে—পাগলামীর একটা মাত্রা থাকা উচিত।

বৃষ্টি তখন বেশ গা এলিয়ে নেমে পড়েছে কঙ্কন হাত ইসারায় ড্রাইভারকে ডাকতে যায়—কিন্তু ঝুমুর ওর হাত চেপে ধরে বলে—না, না, ডাকবেন না। আজকে আমি ভিজব, আপনি বরঞ্চ বাড়ী চলে যান।

ভাল কথা গুণ্ডা এসে কোল পাঁজা করে নিয়ে যাক, অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছেন কি? তা ছাড়া এই বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ ঝলসানো মনটা নিয়ে আপনার বাড়ীতে গিয়ে দেখি বাড়ী খালি, মোক্ষদা বললো আপনি এধারে এসেছেন, পড়ি কি মরি করে ছুটে

এলাম, আর আপনি বলেন চলে যেতে। কঙ্কন ওয়াটার প্রুপটা খুলে ঝুমুরের গায়ে পরিয়ে দেয়।

বাধা দিয়ে ঝুমুর বলে, তা হয় না। আপনি ভিজবেন, আর আমি স্বার্থপরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো নাকি?

এ ছাড়া উপায় কি আছে, চলুন তবে গাড়ীতে উঠি।

না তাও পারব না।

ওয়াটার প্রুপটা খুলে অর্দ্ধেকটা কঙ্কন নিজের মাথায় আর অর্দ্ধেকটা ঝুমুরের মাথায় দিয়ে চলতে সুরু করে, কঙ্কন সান্নিধ্যের গভীরতাকে আরো গভীর করবার জন্য আস্তে ডান হাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে।

হঠাৎ ঝুমুরের মনে হয় বিভূতির কথা "তীব্র শীতে একটা কোটের নীচে ঢুকে আশ্রয় নেবার সেই যে নিবিড় ভঙ্গি"।

কঙ্কন বলে—কিছুই কিন্তু হচ্ছে না দুজনকেই ভিজতে হচ্ছে।

তা হোক।

কঙ্কন ঝুমুরকে আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বলে—বেশ আমি তবে বাড়ী ফিরে যাই।

এ অবস্থায় থেকে ফিরে যেতে পারে দু'জাতীয় পুরুষ, যারা ভোগ করে করে নারীর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে তারা, আর পারে যারা পুরুষ নয় তাবা। কোন পবিত্র যৌবন এ আবেশের মোহ ছেড়ে যেতে পারে না।

কথাটা আমিও মেনে নিচ্ছি, ভালবাসার ব্যাপারে আর প্রত্যেকের মতই আমি অতি সাধারণ। যোগীও নই সংযমীও নই।

ওরা দুজনে একটু থেমে পড়ে। বৃষ্টি-ঝরা মুক্ত আকাশের নীচে গভীর অন্ধকারে ভালবাসার নিবিড়তার প্রথম ছোঁয়াচ, এঁকে দেয়, একবার, দুইবার, তিনবার—পরস্পর।

আরো কিছুটা এগিয়ে—কঙ্কন বলে এবার ফিরে যাওয়া উচিত।

রাত্রি তখন ন'টা।

ঝুমুর ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, মোক্ষদা মাসীর সামনে একসাথে গিয়ে দাঁড়াব।

না, তা করা উচিত নয়। ওদের আদর্শ আমাদের আদর্শ নাও হতে পারে; তা ছাড়া অপরের আদর্শে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমাদের নেই। কঙ্কন গাড়ী থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, ঝুমুর গাড়ীতে উঠে একটা হর্ণ দিতেই ড্রাইভারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ড্রাইভার অপ্রস্তুত হয়ে বলে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মানুষের মনের চাইতে মনস্তত্ত্বটাই বোধ হয় বড়। ঝুমুরেব চেহারাটা সাত আট দিনের মধ্যে অদ্ভুত শ্রী ধারণ করে।

যশোদা মোক্ষদাকে বলে—বলি বউদির দিকে একটু লক্ষ্য রেখো।

লক্ষ্য বেখেই বা কি করবো, মনিবের সাথে তো আর মোকদ্দমা লড়তে পারব না, মোক্ষদা উত্তর করে।

এই ফাঁকে একবার বিভূতি দাদাবাবুকে খবর দাও না।

কাকে, বিভূতিকে! তুইও ভাল মানুষ, সে তো শিলিগুড়িতে এক ক্রিশ্চাণীকে বিয়ে করে দিব্যি আছে। যাক, তুই আর বউমাকে একথা বলিসনে। মেয়েটা তবে লজ্জার লাগাম একেবারেই খুলে দেবে।

সেদিন গঙ্গার ঘাট থেকে ফেরবার পর কঙ্কন সাত আট দিন এ বাড়ীর্তে আসেনি, ঝুমুরের মনটা ছটফট করে, এক বার ভাবে আসবার জন্য চিঠি দেবার কথা, আবার কি ভেবে থেমে যায়। ঝুমুর ভাবে আসছে কাল রবিবার, কাল পর্যন্ত দেখে নি তারপর যা হয় করা যাবে। আর একটা দিন অপেক্ষা করতে হয় না, ভিজে সুইমিং কষ্টিউমটা হাতে নিয়ে, একটা স্পোর্ট জার্সি আর ধুতি পরে কঙ্কন উঠানে এসে মোক্ষদাকে বলে—মোক্ষদা মাসী একটু চা খাওয়াবে। ভিজে চুল গুলো আঙ্গুল দিয়ে পাট করতে করতে কঙ্কন একবার ওপরের দিকে তাকায়। দেখে ঝুমুর রেলিংএ ঠেস দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

মোক্ষদা কিন্তু কঙ্কনকে বিশেষ অপছন্দ করে না। বউমার বেহায়াপনাটাই তার চোখে একটু বেশী লাগে।

মোক্ষদা কঙ্কনকে নিজের হাতে চা করে দেয়।

চা খেতে খেতে কঙ্কন বলে বউমার মাথায় ছিট আছে না মাসী ?

তা বাছা সোমত্ত মেয়ে স্বামীর ঘর করতে পারল না ; বিয়ের প্রথম রাতেই হাতাহাতি, তবে বাছা বৌমার যত দোষই থাক এক পা এগুতে তিনবার জিজ্ঞেস করে, এত টাকার মালিক হয়েও দেমাক নেই ; তা ছাড়া আমায় সম্মান করে।

ঝুমুর ঘরে ঢুকে বলে মাসী আমায় বুঝি এক কাপ চা দিতে নেই ?

মোক্ষদা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, ষাট বাছা তোমারি তো সব, মোক্ষদা ঝুমুরের চায়ে বেশী করে দুধ চিনি দেয়।

ঝুমুর চা খেতে খেতে বলে, আজ আমরা বেড টি খাচ্ছি।

মোক্ষদা চায়ের পাট তুলে ওপরে যায়। কঙ্কন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে, জলে ভিজে শরীর ভাল ছিল তো ?

সাত দিন বাদে কুশল জিজ্ঞাসা করতে এলেন নাকি ?

নিজের কুশল বোঝবার জন্য সাত দিন সময় নিয়েছিলাম, আর …আর একজনকে তার কুশল বোঝবার সময় দিয়েছিলাম।

পরিমিত খাওয়া মানুষের দেহ রক্ষার দাবী পরিপাটিতে থাকা পারিপার্শিক দাবী। মনের বুভুক্ষার কি কোন দাবী নেই ?

মনের বুভুক্ষার সাথে সাথে দেহের কামনাও দাবী জানায়। সামাজিকেরা মন যেখানে মেনেছেন দেহ সেখানে মানেননি, দেহ যেখানে মেনেছেন মন সেখানে মানেননি। স্বামী-স্ত্রী তাই বিশ ত্রিশ বৎসর ঘর করেও নিজেদের ঐ আর্য্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু দেহ আর মনকে যাঁরা একসাথে মানতে গিয়েছেন তাঁরা সমাজে কোন দিন স্থান পান নি।

কে চায় এমন মিথ্যে সমাজকে যে সমাজে চোরাবাজারে স্ত্রীলোক বিক্রি হয়, যে সমাজে সন্তানকে জননী নিজের হাতে বিষ তুলে দিতে পারে, যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে চেনেন না অথচ অভিন্ন আত্মা বলে পরিচয় দেন, এমন সমাজ গোষ্ঠির মধ্যে আমি একদিনও থাকতে চাইনে।

যতগুলো কথা এখানে বলা হলো, এ অন্যায় গুলো সবই এসেছে বুভুক্ষিত কামনা থেকে। আমরা কিন্তু ঠিক সেই কামনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এই কথাটাই বোঝাবার জন্য সাত দিন আসিনি। এ না আসার মধ্যে আমার দিক থেকে কোন অনাদর অথবা উপেক্ষা ছিল না।

আজকে ভাবছি একটু ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাব। কেউ আমার সাথে গেলে ভাল হ'তো।

হুঁ বুঝেছি, 'বাৎসায়ন' বলেছেন এরকম কোন কাজ করো না যাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয়। কিন্তু যদি প্রয়োজন বোধ কর, তবে প্রথম দিন প্রার্থীকে উপেক্ষা করো, দ্বিতীয় দিন তাকিয়ে দেখো তার পরেও সে যদি তোমাকে চায়, যদি তোমার দেবার অবস্থা থাকে তাকে পরিতৃপ্ত করো। বাৎসায়নের উপদেশ আমি এ ক্ষেত্রে শিরোধার্য্য বলে মনে করি।

ঝুমুর টেবিল ক্লথের পাশ থেকে সূত ছিঁড়তে থাকে,

সুখী? কঙ্কন প্রশ্ন করে।

ঝুমুর এক গাল হেসে বলে, ছুটির সময় তবে ড্রাইভারকে আসতে বলে দি।

পান্না দু'প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে কঙ্কন দু'প্লেট খাবার দেখে বলে, বাড়ীর লোকজনেরা কিন্তু আমার পজিসনটা বুঝে ফেলেছে, কথাটা বলে কঙ্কন প্লেট দুট আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ঝুমুর বলে কি হয়েছে বুঝলই বা। কঙ্কন বলে, একটা কথা কিন্তু উদ্ধার করেছি, মেয়েরা বউ হলে শান্ত হয়, আর প্রেমে পড়লে

ডেসপ্যারেট হয়। কথাটা বলে কঙ্কন ঝুমুরের মুখে একটা মিষ্টি তুলে দিয়ে ঝুমুরের খাওয়া আধখানা মিষ্টি নিজে খেয়ে নেয়।

ঝুমুর একটু হেসে বলে বুঝেছি তবে সন্ধ্যায় ডায়মণ্ড হারবারে যাওয়া ঠিক তো?

নিশ্চয়ই, কঙ্কন উঠে পড়ে।

সন্ধ্যে ছ'টায় মোটরটা ছুটে চলেছে হু হু করে। শীতের বাতাস কন কন করছে ঝুমুর আর কঙ্কন পাশাপাশি বসে।

কঙ্কন ঝুমুরের কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা ঘষে দিতে দিতে বলে আমার মনে হয় কয়েকদিন বাইরে গেলে মন্দ হয় না।

আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু·····

বুঝেছি অসুবিধে অনেক আছে, কিন্তু হু, হু করে ঝড় উঠেছে, এ ঝড়কে থামাতে হলে, হয় খুব দূরে চলে যেতে হয় নয়তো গভীর ভাবে কাছে আসতে হয়।

তবে যে করেই হোক কোথাও যাব।

কঙ্কন বলে, হ্যাঁ ভাল কথা ভালবাসায় পড়ে ভাল কাজ করার কথা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় অনাথ আশ্রমের সম্পূর্ণ কাজ প্রায় শেষ. হয়ে এসেছে। একদিন জনসাধারণের সামনে একটা ছোট খাট উৎসব করে এর দ্বার উদ্ঘাটন করা উচিত। মেয়েদের একটা জিনিস আমি কিন্তু খুব অদ্ভুত দেখলাম।

কি অদ্ভুত, ঝুমুর প্রশ্ন করে।

নিঃসঙ্গ জীবনে তারা অনেক বড় বড় কাজ করে থাকেন যেমন বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, দেবালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা, যেই তারা ভাল-বাসার স্পর্শ পায়, তখন তারা বিশ্ব সংসারকে ভুলে যায়, এমন কি তাদের কর্ম-চেতনাও নিষ্প্রভ হয়ে আসে অনাথ আশ্রমের কথা আগে খুব শুনতে পেতাম আজকাল তো কিছুই শুনি না।

যার হাতে ছেড়ে দিয়েছি সে ওটাকে নিশ্চয়ই গড়ে তুলবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

বিশ্বাসের জ্বালায় যে নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম হয়েছে।

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে ডায়মণ্ড হারবারের নদীর ধারে নামে। নদীর সামনের দিকটায় অনেক লোক ঝুমুর কঙ্কনের হাতটা জোরে টান দিয়ে বলে ওধারে নয় এস একটু নিরিবিলিতে এইধারে বসি।

বাধা দিয়ে কঙ্কন বলে—ওধারে ভীষণ সাপের ভয়।

হোক সাপের ভয়, তবুও বসবো।

কঙ্কন ঝুমুরকে গরম কোটটা পেতে বসতে দেয়। সত্যি ওদের পাশ দিয়ে একটা সাপ চলে যায়। কঙ্কন ঝুমুরকে বলে, আচ্ছা ধর আমায় এখানে সাপে কামড়ে দিলো, আর সাপের বিষে আমি মরেও গেলাম, বেহুলা হয়ে ভেলা ভাসিয়ে একা একা তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারবে ?

বেহুলা যদি আট দশ বৎসর স্বামীর ঘর করতেন, আর তিন চারটি ছেলের মা হতেন, তা হলে হয়তো ভেলা ভাসিয়ে যেতে পারতেন না। বাসর রাতে লক্ষীন্দরকে সাপে কেটেছিল বলেই বেহুলাও ভেলা ভাসিয়েছিলেন। কেননা নূতন আমেজটা তখন দুরন্ত হয়ে তাঁর দেহমনে জড়িয়েছিল। আজকের দিনে সাপে কামড়ালে ভেলা হয়ত ভাসাতে পারব না কিন্তু বিষটা মুখ দিয়ে চুষে নেবার চেষ্টা করবো নিশ্চয়ই।

অন্ধকার তখন জমে এসেছে, কঙ্কন ঝুমুরের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বলে, সত্যি প্রেমে পড়লে দেখছি সাপের ভয়ও থাকে না আর অন্ধকারটাও বেশ মধুর লাগছে। চাঁদ উঠলে ভীষণ রেগে যাব। শ্রীরাধা কিন্তু অদ্ভুত ভাবুক ছিলেন, চাঁদকে গালাগাল দিয়ে হয়তো এমনি একটা মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন।

গরল সহোদর গুরু পত্নী হর
রাহু কন্যা উগারা।"

রাতটা তখন গভীর হতে সুরু করেছে। কঙ্কন বলে এবার বাড়ী ফেরা উচিত।

আবার সেই মস্ত বড় বাড়ীর ভেতর!

সারা রাত এখানে এভাবে থাকলে সকালে উঠে আমরা নিজেরাই লজ্জা পাব। কঙ্কন ঝুমুরের কাছে মৌন আবেদন জানায়। তীব্র মধুর স্পর্শ দীর্ঘ স্থায়ীত্বের মধ্যে সেদিন ওদের আরো কিছু পাবার আভাস জানিয়ে দেয়। কঙ্কন ঝুমুরকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে বলে কাল আমরা অনাথ আশ্রম দেখতে যাব।

ঝুমুর সস্মিত মুখে সম্মতি জানায়।

পরের দিন ঝুমুর অনাথ আশ্রম দেখতে আসে। ফটকের সামনে শ্বেত পাথরে দিদিমার নাম বড় বড় হরফে ক্ষোদিত। সম্পূর্ণ বাড়ীটার প্ল্যাসটার ছাড়িয়ে নূতন প্ল্যাসটার লাগিয়ে, তাতে চুণ ফেরানো হয়েছে উঠানে নূতন মাটি ফেলে তাকে দুরমুজ পিটিয়ে সমান করা হয়েছে। উঠানের চার পাশে ফুলের গাছ, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটে আছে। বাড়ীর পশ্চিম দিকটায় মেটে গোয়াল ঘরে পাঁচ ছয়টি গরু। কঙ্কন বলে, গরুর দুধ বাচ্চারা খেয়ে যেটা উদ্বৃত্ত থাকছে সেটা পাড়ায় বিক্রি করে যা পাওয়া যাচ্ছে, দুটি চাকরের মাইনে সবই কুলিয়ে যাচ্ছে। বাড়ীর পেছনে পড়ো জমিতে টম্যাটো, ঢ্যাড়স, পালং শাক ইত্যাদির বীজ ছড়ানো হয়েছে। বাড়ীর সামনের সামান্য জায়গায় শিশুদের খেলার ব্যবস্থা করার আয়োজন চলছে। একতলার ঘরগুলো পরিষ্কার করে ছোট ছোট খাট পেতে বিছানা পাতা হয়েছে, ঘরের বারান্দায় পাঁচ ছ'টা দোলা ঝুলছে, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারটি শিক্ষিত নার্স আর তিনটি দাই রাখা হয়েছে। বাড়ীর ভেতরের দুইটি ঘর ডাক্তারদের কোয়ার্টার হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঝুমুর যাদের অর্দ্ধমৃত

অবস্থায় দেখে গিয়েছিল, তারা এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা বেশ সতেজ শিশুর মত, তাদের অনাথ বলে মনেই হচ্ছে না। ঝুমুরের মন খুসীতে ভরে উঠে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এ জাতীয় ব্যবস্থা সে ধারণাই করতে পারে না।

কঙ্কন বলে এখনো আরো অনেক কিছু করতে হবে। সেগুলো আমি আমার সহকর্ম্মীদের বুঝিয়ে দিয়েছি, তাতে আরো কিছু টাকার প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে। দিদিমার নামে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

তা তো হবেই, খরচ করতে হলে আট হাজার টাকা আর কটা টাকা।

আমি ভাবছি জমিদারের কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নিলে হয় না, আমার মনে হয় ওদের চাহিদা বেশী নয়, হাজার দশেক টাকায় হয়তো ওরা দিয়ে দেবে।

তাদের সাথে কথাবার্ত্তা কিছু বলা হয়েছে কি? তারা রাজী হলে কিনে নিতে আমার আপত্তি নেই। একটা প্রশ্ন ঃ শিশুদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি?

এখন তিন বৎসর এ বিষয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই, ওরা এখন অনেক ছোট।

মোট এখানে কটি শিশু আছে?

পঁচিশটি।

কিন্তু আমি তো দেখে গিয়েছি পনেরো ষোলটি, এরা কি করে এলো?

যেমন করে তারা এসেছে।

তার মানে?

তার মানে, আমি এটা ধরেই রেখেছি, যে এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্যকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো। সমাজে অসৎ কাজের জন্য ড্রেনেজ থাকা উচিত। নদীর জলে, হ্রদের জলে, কলের জলে

তৃষ্ণা নিবারণ করে, আবার নোংরা বিশ্রী জল নিকাশ করে দেবার জন্য বড় বড় নর্দমা আনডার ড্রেন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করে। এ শিশুদের চাইতে এদের মায়েরা আরো অসহায়। যখন এরা এদের মায়েদের গর্ভে থাকে, তারা যদি দুঃখে ভয়ে লজ্জায় আত্মহত্যা করে তবে এরা ভূমিষ্ঠ হতে পারে না, তাই এদের অসামাজিক জননীরা মাস পাঁচেক এখানে থেকে এদের ভূমিষ্ঠ করে আমাদের হাতে দায়িত্ব ভার তুলে দিয়ে চলে যান। এঁদের কথা চিন্তা করে এঁদের জন্য একটা গোপন ব্যবস্থা করে রেখেছি। এঁদের নাম ধাম বলার রীতি নেই, এঁরা বললেও আমরা শুনবো না। সন্তানটির প্রসব করে চলে যাওয়া শুধু এঁদের কাজ।

এসব কথার ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে অতীব অন্যায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্রয় পাচ্ছে। দিদিমার নামে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমাদের তো আপত্তিও থাকতে পারে।

এটা মানুষের ভুল ধারণা কেননা সমাজপতিরা অজ্ঞ নন তাঁরা এ জাতীয় জন্মের ইতিহাস আগেও দেখেছেন, এখনো দেখছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেখবেন। কিন্তু কি জাতীয় ব্যবস্থা করলে এ শিশুগুলোকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়া যায় এ নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ওঁদের মতে যেমন চলছে তেমনি চলুক ভাবটা চিরন্তনী, আমাদের সমাজ আছে সংস্কার নেই। দিদিমার নামে এ প্রতিষ্ঠান চালাতে পারলে, তাঁর আত্মার পরম সদ্‌গতি হবে। এতে আপত্তি করার তো কিছু নেই।

কিন্তু দেশের যুবশক্তি এত উচ্ছৃঙ্খল কেন হবে, কিছুটা তো সংযত হওয়া উচিত।

দেশের যুবশক্তি মোটেই উচ্ছৃঙ্খল নয়, তা যদি হতো তবে বিয়াল্লিশ কোটীর মধ্যে বাইশ কোটী এই অনাথ আশ্রমে আসতো, এসেছে মাত্র পঁচিশটি। এই পঁচিশটির জন্য সারা দেশের যুব সম্প্রদায় দায়ী নন। আর কেন উচ্ছৃঙ্খল হবে, এ কথার উত্তরে

তাদেরও বলবার অনেক কিছু থাকতে পারে। পূর্ব্বকালে মেয়েদের পাঁচ বছরে ছেলেদের আট বছরে বিয়ে হতো। তেরো বৎসর বয়স থেকে তারা সঙ্গী পেয়ে সমস্যার সমাধান করতো, এখন ত্রিশ বৎসরের ছেলে মেয়েদেরও সঙ্গী হীন হয়ে থাকতে হয়। এই ত্রিশ বৎসরের বুভুক্ষু দেহতত্ত্বের তাড়না, আমাদের মা, ঠাকুরমাকে পিতা অথবা পিতামহকে ভোগ করতে হয়নি, তাই এ যুগের সমস্যার গভীর বেদনা তাঁরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন না। খালি মিথ্যে বুলী বলে ছেলেমেয়ে নাতিপুতিদের প্রবোধ বাক্য দিয়ে নিজেরা দরজায় খিল বন্ধ কবেন। চুবি করে খাসনি বলে ভাঁড়ারের চাবিটা একটা সাধাবণ জায়গায় লুকিয়ে বাখার মত জিনিষটা একেবারেই অবাস্তব। হয় ভাড়াবের চাবি তাদের হাতেই তুলে দিয়ে বলতে হবে ওরে বুঝে শুজে খাস, নয়তো ওটাকে নিজেব ট্যাকে গুঁজে রাখতে হবে। ছেলেমেয়েবা এক সাথে লেখাপড়া শিখবে, এক অফিসে কাজ করে অর্থ উপার্জ্জন করে আনবে, কিন্তু মিশতে পারবে না। নিজের দেহের পাশে লক্ষ্মণের পবীখা টেনে রেখে বলতে হবে গণ্ডীব বাইরে যাওয়া নিষেধ, সেটা কি সম্ভব? গণ্ডীর বাইবে এলে রাবণ হরণ করে নেবে একথা জেনেই আজকাল-কার ছেলেমেয়েরা গণ্ডীর বাইবে এসে দাঁড়ায়। যার ফলে এই শিশুগুলির জন্ম হয়। স্বাভাবিক অপরাধীকে অপমৃত্যুর পথ না দেখিয়ে যদি তাকে বেঁচে থেকে ন্যায় পথ অবলম্বন কবতে বলা হয়, সেটা কি খুব গভীর পাপ? জগাই মাধাই কি শ্রীচৈতন্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন না, শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইকে ক্ষমা করে তখনকার সমাজকে ক্ষমা করেছেন এবং সেই সমাজকে গঠন করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখন আমরা চীৎকার ক'রে বলি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তিনি অবতার ইত্যাদি কিন্তু তাঁর সত্য মতবাদের কোন অর্থই আমরা বুঝি না। তিনি কৃষ্ণ নামে বিমোহিত ছিলেন এইটাই আমরা বুঝি, কিন্তু তিনি যে কৃষ্ণ নামের সাথে সাথে

কৃষ্ণ ভূমিকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, এটা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারি না। এই শিশুরা বড় হয়ে কত মহৎ কাজ করতে পারে, সৈনিক জীবনে এদের কর্ণের মতই হয়তো বৃহৎ অবদান থাকতে পারে, কেননা ছোট বেলা থেকেই, কোন মা এদের আগলিয়ে নেবে না, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এটা সহজেই অনুমান করা সম্ভব। এদের বলিষ্ঠ হবারও কথা কারণ উভয়তঃ প্রথম পরিপুষ্ট যৌবনের সন্তান এরা। সুতবাং এদেরও বেঁচে থাকবার প্রয়োজন সমাজে আছে।

ঝুমুর ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটা দেখতে থাকে, বাড়ীটা সত্যি বেশ বড়, ইচ্ছে করলে একে আরো বাড়িয়ে নেওয়া যায়। কঙ্কন বলে—টুক টাক কাজগুলো সম্পূর্ণ সারতে আরো সাতদিন সময় লাগবে, সাতদিন বাদে, ভাবছি প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের সমক্ষে উদ্বোধন করবো।

বর্ত্তমানে এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার কে নিয়েছেন ?

আমার বন্ধু মহেন্দ্র, ওর মত কর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ আমি খুব কমই দেখেছি, আমি চলে গেলেও এ প্রতিষ্ঠান সে অনায়াসে অতি সুচারুরূপে চালাতে পারবে। ঝুমুর সম্পূর্ণ আশ্রমটি দেখে বিদায় নেয়, যাবার সময়ে আশ্রমের কর্ম্মীরা ওর গাড়ীর কাছে এসে ওকে অভিবাদন জানায়।

ঝুমুর বাড়ীতে এসে মোক্ষদার মুখে শোনে, কে একজন দেশ্লের ছেলে ঝুমুরের জন্য আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে। ঝুমুর বাইরের ঘরে এসে দেখে ধেনো বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

এই যে মহাপুরুষ পুরকায়স্থ !

ধেনো একটু হেসে বলে হ্যাঁ দেবীর মন্দিরে ধন্না দিয়েছি দর্শন না পেলে কিছুতেই উঠবো না।

ফিরতে একটু দেরী হয়ে গেল, তা কি মনে করে ?

দেশে যাচ্ছি, তুমি কি জ্যাঠাইমাকে কোন চিঠিপত্র দেবে ?

না, চিঠি দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করছি নে। শুধু তাঁকে আমার প্রণাম জানিও, বৌদিদের আমার শুভেচ্ছা জানিও।

সংসারে আমি সুখী হয়েছি, কিন্তু তোমাকে যদি সুখী দেখতাম, তাহলে সম্পূর্ণ সুখী হ'তাম। খেনো ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে।

কিন্তু আমি তো অসুখী নই। তোমরা আমাকে অসুখী ভেবে ভুল করছ !

না, না, ওটা তোমার চরম দুঃখের কথা কঙ্কনবাবুর সাথে বিয়ে হ'লে তুমি সত্যি সুখী হতে তাঁর খবর পেলে তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে আসতাম।

আচ্ছা বারে বারে তুমি কঙ্কন বাবুর কথা বল কেন ?

আমি শুধু ভাবি, আমি যদি একটু উদার হতাম হয়তো তোমার জীবনটা অন্য রকম হতো।

দয়া করে তোমার গোপন কথাটা একটু খুলেই বল না ?

সত্য কথা বলতে সৎসাহসের দরকার, অনেক দিন বলবো বলবো করে বলা হয়নি।

বলেই ফেল না এত ভূমিকা করার কি দরকার।

তুমি যেদিন আমার গল্প ফেরত পাঠিয়ে তার সাথে পাঠহীন ছোট চিঠি লিখে অমত করলে সেইদিনই, তোমার নামের একটা চিঠি আমার হাতে এসে পড়লো, চিঠিটা পোষ্টেই এসেছিল। সেদিন আমার কেমন একটা প্রতিহিংসার স্পৃহা জাগলো কেন ঠিক বলতে পারি না, আমি তোমাকে চিঠিটা না দিয়ে, চিঠিটাকে চেপে দিলাম। সে চিঠিটা ছিল কঙ্কনবাবুর লেখা, অদ্ভুত সুন্দর চিঠি। আমি জানি এ জাতীয় অপরাধের ক্ষমা নেই, তোমাকে সত্য কথা বলে অন্তরের ভার লাঘব করলাম মাত্র। এক কথায় বলতে গেলে আশাপ্রদ একটা সুন্দর জীবন আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি।

তোমার সংসার কিন্তু কোন দিনই আমি ভাঙ্গবো না, কেন না তুমি আমার বাদলা দিনের ধেনো লঙ্কা। কঙ্কনবাবু তো চিঠির কথা আমায় কিছু বলেননি।

হয়তো ইচ্ছে করেই ও প্রশ্ন চেপে গিয়েছেন। তাঁর সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল। ঝুমুর ধেনোর কাছে জীবনে প্রথম মিথ্যে কথা বললো। তোমার বউ নিয়ে দেশে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ মধু কিন্তু তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। তা ছাড়া সেও কিন্তু কম উদার নয়।

ঝুমুর একটু হেসে বলে, আমাবও তাই মনে হয়।

ঝুমুরের মনটা যেন কেন হঠাৎ দমে যায়, ওর ছাড়া ছাড়া কথায় ধেনো সে ভাবটা বুঝতে পারে। একটু খাবাব আর চা খেয়ে ধেনো বিদায় নেয়। ঝুমুব ওকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়।

আরো এক মাস বাদে ঝুমুর বাইরে যাবার জন্য বায়না ধরে।

মোক্ষদা আজ কাল বুঝেও কিছু বোঝে না। ঝুমুরের সংসার আর সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্বিকার ভাব ওকে মুগ্ধ করে। এত নির্ভরতা আজকালকার মেয়েদের মধ্যে আছে সে ভাবতেও পারে না। একদিন দুইদিন, তিনদিন, শেষে ঝুমুর বায়না ধরে যেতে না দিলে আমি কিছু খাব না। অগত্যা মোক্ষদা বাধ্য হয়ে অনুমতি দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় ঝুমুর কঙ্কনকে বলে—কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি, মোক্ষদা মাসী আমায় বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে।

পুরী হয়ে কণারক গেলে মন্দ হয় না, ধর্ম কর্ম দুইই হয়। সাত আট দিন বাদে ওরা পুরী রওনা হয়, মোক্ষদার হাতে সম্পূর্ণ বাড়ী আর খোকার দায়িত্ব ভার দিয়ে। বিষ্টু আর পান্না মিলে মালগুলো সব গাড়ীতে তুলে দেয়। ঝুমুর গাড়ীতে উঠে বলে মাসী গিয়েই তোমায় চিঠি দেবো, ছেলেটাকে তোমরা সবাই মিলে একটু দেখো।

তা বাছা আর বলতে হবে না, ওতো যশোদাকেই মা ডাকছে। যশোদা তাতেই কত খুসী দেখনা ছেলে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা গোপাল সেবা, তোমায় বাড়ী আর ছেলের জন্য কিছু ভাবতে হবে না। ফিরে আসবার মনটা একটু তাড়াতাড়ি করো, যশোদা ওর কানে কানে বলে। কঙ্কন গাড়ীর দোরটা বন্ধ করে দেয়, গাড়ীটা মিনিট খানেকের মধ্যে বাঁক ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

মোক্ষদা কঙ্কনকে বলে, এক সাথে গেলে না কেন বাবা!

আখড়ায় মহেন্দ্রর সাথে একটু দেখা করে বাড়ী হয়ে ষ্টেসনে যাব। বৌমা তোমার, প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে গেলেন।

যথা সময়ে প্ল্যাটফর্মে ঝুমুরের সাথে ওর দেখা।

ঝুমুর বলে, তাও ভাল ভাবলাম মানুষটি বুঝি এড়িয়ে গেল। এক সাথে এলে ক্ষতি কি হতো শুনি?

বিশেষ কিছুই ক্ষতি হতো না, পাড়ার লোকের কাছে মোক্ষদার মুখটা বড় ছোট হতো।

ঝুমুব চুপ করে থাকে। গাড়ী ছাড়তে তখন দশ মিনিট বাকী। কঙ্কন কুলী দিয়ে মাল তুলিয়ে, ড্রাইভার আর সরকার মশায়কে বিদায় দেয়।

ছুটো বার্থ ওদের ছুজনার, খড়্গাপুর পর্য্যন্ত কোন যাত্রী নেই, কঙ্কন ঝুমুরের বিছানাটা পেতে দিয়ে ওকে বসতে বলে। ঝুমুর কিন্তু একটি কথাও বলে না।

কি হলো এত নিঝুম কেন, ভয় হচ্ছে নাকি? গয়না, টাকা, রাজকন্যা এক সাথে লোপাট না হয়ে যায়, না? কঙ্কন হেসে হেসে বলে। গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাবার সাথে সাথে প্ল্যাটফর্ম ষ্টেসন ষ্টলগুলো আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে।

ঝুমুর কঙ্কনকে প্রশ্ন করে, এ গাড়ীতে আর কেউ উঠবে না?

উঠবে খড়্গাপুর থেকে, আজকাল কিন্তু একজনার কথা ভেবে আমার খুব অদ্ভুত লাগে। শুভ রাত্রি থেকে ঝগড়া করে বউ বেরিয়ে

আসে এমন কাহিনী খুব কমই শোনা যায়। খুব বেশী কাছে যেতেই মনটা খচ খচ করে।

খচ খচ করে কেন? ঝুমুর প্রশ্ন করে।

চিরন্তনী সংস্কারে।

কিসের সংস্কার?

একটা শুভরাত্রি ভেঙ্গে দিয়ে হয়তো আর একজনার শুভ রাত্রির শয্যা রচনা হচ্ছে।

একথা কেউ বুঝে থাকলে সে ভুল বুঝেছে। আমার শুভরাত্রি ভেঙ্গে যাবার মূলে কোন মানুষের এতটুকু দায়িত্ব ছিল না। নম্র মন নিয়েই ঢুকেছিলাম, কিন্তু ঢুকেই কতগুলো উলঙ্গ উৎকট ছবি আর ফ্রি মিকসিংএর বক্তৃতা শুনে, এত বিতৃষ্ণা হলো যে কিছুতেই মনকে আর সে লোকটির আশ পাশ দিয়ে ভেড়াতে পারলাম না। আর তার জন্য আমাব এতটুকু চিন্তা নেই। শুনেছি ভদ্রলোক শিলিগুড়ির এক নার্সকে বিয়ে করে বেশ সুখেই আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু কে যেন আমায় বলছিল সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন।

না, সে মিথ্যে বলেছে, মোক্ষদা যশোদাকে বলেছে, যশোদা আমায় বলেছে। আর সন্ন্যাসী হয়ে গেছে শুনেই বুঝি মনটা আজ সব কাজে বাধা দিচ্ছে। গেরুয়া রং করে কৌপীন পরবার কি এতই মর্য্যাদা। সন্ন্যাসী হয়তো সংসারী নাও হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে যে তিনি সংযমী, রিপুজয়ী, তারই বা কি মানে আছে? এজাতীয় সন্ন্যাসীর চাইতে পূর্ণ ভোগীর মর্য্যাদা আমার চোখে অনেক বেশী।

গাড়ীটা তখন একটা একটা করে ছোট ছোট ষ্টেসন পেরুচ্ছে। ওরা দুজনেই বেশ সহজ সুরে কথা বলছে, সামাজিক তর্ক সুরু হওয়ার আবেগটা একটু কম।

মাঝখানে ওরা দু'জনে চা আর খাবার খেয়ে নেয়, কি করে যে এতটা সময় কাটে দু'জনের একজনও বুঝতে পারে না। খড়্গাপুরে

ভদ্রলোক যথা সময় তাঁর বার্থে উপস্থিত হন। ওরা দু'জনে দু'টো বই নিয়ে পড়তে সুরু করে। মাঝে মাঝে চাপা দু'একটা কথা বলতে থাকে তাও অনেকক্ষণ পরে পরে। তর্ক তখন সম্পূর্ণ থেমে গিয়েছে। রাত্রি এগারোটায় কঙ্কন লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। ঝুমুরও চোখ বুজে ঘুমের আরাধনা করতে থাকে।

পুরীতে এসে ওরা হোটেলে ওঠে। একটু চা খেয়ে ওরা দুজনে সমুদ্র নাইতে যায়। দুরন্ত ঝুমুর লুনিয়ার জন্য একটুও অপেক্ষা না করে একাই জলে নেমে পড়ে। কঙ্কন কিন্তু ওর হাতটা চেপে ধরে বলে দাঁড়াও একটু, লুনিয়া আসুক।

লুনিয়া টুনিয়া ডাকতে হবে না তুমি আমার হাত ধর।

সেকি! তোমার কি মাথা খারাপ হলো?

আজ্ঞে না, মাথাটা আমার ঠিকই আছে, কলকাতাব পুকুরে রোজ সুইমিং কসটিউম পরে সাঁতার দিয়ে লক্ষ লোকের হাততালি পাও, আজ তোমায় দেখাবো, জল আমার না আমি জলের।

কঙ্কনের পৌরুষে ভীষণ আঘাত লাগে ও আর বাক্য ব্যয় না করে ঝুমুরের সাথে জলে নেমে পড়ে সমুদ্র বন্দনা করে। তারপর একটা একটা করে ঢেউ পেরুতে থাকে।

খুব জোরের একটা ঢেউএ কঙ্কন একটু বেসামাল হতেই ঝুমুর ওকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে এসে বলে, খবরদার আমার হাত ছেড়ো না, হাত ছাড়লেই বিপদে পড়বে।

ওরা দুজনে অনেক দূর এগিয়ে যায়, ঢেউ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে। কঙ্কন বলে, আর যাওয়া ঠিক নয় এবার পাড়ের দিকে ফিরে চল।

ঝুমুর বলে, চল আরো খানিকটা এগিয়ে যাই, ঐ যেখানে ওরা মাছ ধরছে, গভীর সমুদ্রে নাইতে কত ভালো লাগে দেখবো।

না, না, আমার আর যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না সমুদ্রে কত বড় বড় জীব জন্তু আছে জান না, বুঝি ?

ঝুমুর ওর আপত্তি দেখে, পারের দিকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, সমুদ্রের ধারের লোকেরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের স্নান দেখছে।

কঙ্কন বলে তুমি এত অশান্ত! বাবারে। আর একটু হলে ডুবিয়ে মেরেছিলে আর কি। আমি কিন্তু স্নান করে আরাম পেলাম না, মেয়েমানুষ গভীর জলে ভয় পেয়ে একবারও আমায় জড়িয়ে ধরলে না। উল্টে আরো তোমার আঁচলই আমায় ধরতে হলো।

ছোট বেলায়, আমি আর ধেনো আমাদের গ্রামের নদীতে এমনি করেই সাঁতার কাটতাম।

ধেনো কে, কঙ্কন প্রশ্ন করে।

ভয় নেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

বিয়ে তো তোমারো হয়েছিল।

তা হয়েছিল বটে, তবে তফাৎ একটু আছে। ধেনোর বউ পরেছে সিন্দুর আর আমি পরেছি খুন খারাপী রং। ঝুমুরের ইচ্ছে হয় কঙ্কনকে চিঠির কথাটা একবার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু ধেনো চিঠি আটকেছিল, একথা বলে কঙ্কনের কাছে ধেনোকে ছোট করবার ইচ্ছে তার হলো না, তাই ও কথাটা সে আর মুখের বার করলো না।

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে বালু ভাঙ্গতে সুরু করলো, সমুদ্রের উপরে ওদের হোটেলটা। ওরা হোটেলের দিকে রওনা হ'লো। সন্ধ্যে বেলা ওরা জগন্নাথের মন্দিরে গেল— হাঁটা পথে। রাস্তায় যেতে যেতে কঙ্কন ওকে বলে— জগন্নাথের ওপর আমার একটা সত্যিকারের টান আছে, তাই তো তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলাম। এখানে ভগবানের রূপকে ব্যাখ্যা করে মানুষকে মিথ্যে পথের প্রলোভন

দেখানো হয়নি। তিনি যোগী, তিনি সন্ন্যাসী, তিনি নিষ্কাম, এ সব কথা বলে, তাঁর রূপকে কুয়াশাচ্ছন্ন করা হয় নি। মহাপ্রভু চেয়েছিলেন না, সাধারণের কাছে অসাধারণ কিছু হয়ে থাকতে সর্ব্বজীবে নারায়ণের সব রকম সত্যকে এখানে সম্পূর্ণভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। তাই জীবের মনের রূপ আর দেহের রূপ আলাদা করে দেখানো হয়েছে।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না।

ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারবে।

কথা বলতে বলতে ওরা মন্দির প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ায়। কঙ্কন বলে,—দেখেছ, কি বিরাট মন্দির, আর সে যুগের অদ্ভুত চারু শিল্প।

ঝুমুর এক মনে দেখতে থাকে, একটু পরে ও বলে, কিন্তু দেওয়ালের ছবিগুলো এত বিশ্রী কেন, ভগবানের মন্দির!

তাতে কি হয়েছে, ভগবান ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বাঞ্ছা যাঁর আছে তিনি কোন দিনও যোগী নন নিষ্কামও নন, তাই তিনি জানেন জীবের প্রথম এবং চরম বাঞ্ছাই এই রূপ, এই ভোগ, এই আনন্দ। তাই জীব দেহ যত ক্লেদ-যুক্তই হোক না কেন সৃষ্টিকে রক্ষা করবার জন্য, পালন করবার জন্য, পৃথিবীর কামনাকে নিজের কামনা বলে গ্রহণ করেছেন, তার নাম দেহী নারায়ণ, আর পরমাত্মার রূপ দেখবে মন্দিরের ভেতরে।

তবে চৈতন্যদেব কেন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, যবন হরিদাস কি করে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন, ঝুমুর প্রশ্ন করে।

শ্রীচৈতন্য, দুটো দুটো বিয়ে করে ভোগ মিটিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বলেই তিনি সার্থক গেরুয়া অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু যবন হরিদাসকে বেশ্যা দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল তাই তিনি বারবনিতার কাছে মাথা না নুইয়ে, উল্টে তাকেই আরো হরিভক্ত করে তুলেছিলেন। হরিদাস পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, পরম ভক্ত হয়েছিলেন কিন্তু হরিদাস যদি ঝুমুরের মত মেয়ের হাত থেকে ত্রাণ পেতে পারতেন, তবেই বুঝতাম তিনি সন্ন্যাসী।

ঝুমুর রাগ করে বলে, কেন আমি এতই খারাপ যে ঐ রকম উদাহরণ দিলে !

কথাটা তুমি বুঝলে না ! আমি বলছি, রমণী—যার সৌন্দর্য আছে, জীবনের আদর্শ আছে, শিল্প বোধ আছে, সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতি আছে, শ্রীচাতুর্য্য আছে, সহ্য আছে, শ্লীলতা আছে, পুরুষ তাঁর কাছে মন্ত্রমুগ্ধ না হয়ে পারে না।

ঝুমুরের হাত ধরে কঙ্কন সিঁড়ি ভাঙ্গতে থাকে। ভক্তেরা সবাই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে দোর খোলার প্রতীক্ষায়, বৈষ্ণব ভক্তেরা খোল করতাল বাজিয়ে পরম উৎসাহে কীর্তন করছে, স্ত্রীলোকেরা রাঙ্গা পাড়ের পট্ট বস্ত্র পরে গলবস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুগ্ধতার এমন সুন্দর সমাবেশ ঝুমুরের চোখে আর কখনো কোথাও পড়েনি। কিছুক্ষণ পরেই "জয় প্রভু, জগন্নাথ" বলে মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করার সাথে সাথে ভীষণ ভীড়। কঙ্কন ঝুমুরকে জড়িয়ে ধরে ভীড়ের মধ্যে হাঁটতে থাকে। ও বলে মানুষ সমুদ্রে আমি তোমার কাণ্ডারী, জল সমুদ্রে একটু কেরামতি দেখিয়েছিলে বটে ; ভীড়ের চাপে ঝুমুরের নিঃশ্বাস বন্ধের উপক্রম হয়। যা হোক ওরা পায়ে পায়ে একটু একটু এগিয়ে, একেবারে জগন্নাথের সামনে এসে দাঁড়ায়। কঙ্কন বলে এস এক সাথে দুজনে প্রণাম করি। ওরা দুজনে হেঁট হয়ে প্রণাম করে। অদ্ভুত মূর্তি, হাত নেই কিন্তু তবুও অপূর্ব্ব শ্রীযুক্ত—, কঙ্কন বলে এঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কারা জান, নীচ অন্ত্যজ জাত শবর !

তাই নাকি ?

হ্যাঁ কেননা প্রথম ভক্ত শবর এর প্রেমানুভূতি পেয়েছিলেন, অনন্ত নীল সমুদ্রের উত্থান পতনে, ইনিই জীবের পরম আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, শ্রীজগন্নাথ। আর ঐ দেখ বলরাম, যাঁর বাহু-বীর্য্যে কালো মাটি অঙ্কুর-সম্পন্ন হয়, তাই ওঁর নাম হলধর। ইনি সুভদ্রা, অর্থাৎ সর্ব্ব গুণ সম্পন্না নারী, কৃষ্ণের ভগ্নী অর্জ্জুন-পত্নী, তাই জগতের আদর্শ নারী হিসাবে তাঁরো স্থান কৃষ্ণ পার্শ্বে।

মন্দিরের সম্পূর্ণ আরতি দেখে, ওরা প্রণাম করে বেরিয়ে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। কঙ্কন বলে জগন্নাথের ভোগ রান্না দেখবে ? আচ্ছা দাঁড়াও পাণ্ডাদের কিছু দিলে ওরা অনুমতি দেয় কিনা দেখি।

মিনিট পাঁচেক পরে কঙ্কন ফিরে এসে বলে—"এস আমার সাথে"। ওরা ভোগ রান্না ঘরের পেছনের ঘুলঘুলি দিয়ে, ভোগ রান্না দেখতে থাকে।

ঝুমুর বলে জগন্নাথের ভোগ রান্না করছে, মুখ বেঁধে নেয়নি কেন, পান দোক্তা খাচ্ছে, থুথু ফেলছে, রাঁধতে রাঁধতে গল্পও করছে, আমার দিদিমা বেঁচে থেকে যদি এ দৃশ্য দেখতেন, তবে মহামারী কাণ্ড বাধাতেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু ভোগটা যখন সবার সামনে দিয়ে নিয়ে যাবে তখনকার ভঙ্গিটা এদের এত সুন্দর যে ভোগের প্রতি ভক্তি না এসে পারে না। প্রত্যেকে পরিষ্কার জামা কাপড় পরবে, রুমাল দিয়ে নাক বেঁধে নেবে, ভোগের সামগ্রী যে ধার দিয়ে মন্দিরে যাবে শুদ্ধাচারে সে রাস্তা ধুয়ে ফেলা হবে, তারপর সারি সারি এক সাথে ভোগের সামগ্রী শ্রীমন্দিরে ঢুকবে।

ভগবানের সাথে প্রবঞ্চনা ? ঝুমুর বলে ওঠে।

না ঠিক প্রবঞ্চনা নয়, এটাও একটা ভক্তির অঙ্গ। যেমন বিভূতি বাবু বিয়ের রাতে তোমাকে বিশ্রী ছবি দেখিয়ে, তোমার বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই একই ছবি আমিও দেখালাম দেব মন্দিরে, কিন্তু তাঁকে বর্জন করে এলে, অথচ আমাকে তুমি কি গভীর না ভালবাসছ। ঠিক সেই রকম জ্ঞানীর ভোগে আর অজ্ঞানীর ভোগে এতখানি প্রভেদ। প্রকৃত ভক্তের কাছে মহাপ্রভুর চরণামৃত ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। কথা বলতে বলতে ওরা আবার রাস্তায় আসে, ফেরবার পথে একটা গাড়ী করে বাড়ী ফেরে। হোটেলে আহারাদি শেষ করে, ওরা ঝাউবন দেখতে যায়, তখন প্রায় বেলা দুটা দুপাশে বালুর পাহাড় উঁচু

নীচু পথ ওরা ভাঙ্গতে থাকে। ঝাউবন খুব কাছের পথ নয়, হলোই বা অনেক দুর, আজকে ওদের ক্লান্তি নেই ওরা দুজনে পাশাপাশি চলেছে পরম আনন্দে। হাঁটতে হাঁটতে কঙ্কন বলে—পুরীতে এসে তোমার ভাল লাগছে ?

হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

ভাল না লাগলে ভালবাসা যায় না। ভাল লাগাটা আসক্তি আর ভালবাসাটা তার অভিব্যক্তি। বিভূতি বাবুকে তোমার প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি তাই তুমি ভালবাসতে পারনি।

ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর রোদটা কমে আসতে থাকে কঙ্কন বলে রোদের ভেতর খুব কুষ্ট হচ্ছে না ?

না, কষ্ট আবার কি ? দেশ দেখতে হলে এমন একটু আধটু কষ্ট করতে হয়।

ফেরবার পথে পুরীর সূর্য অস্ত দেখে তবে হোটেলে ফিরবো ঝুমুর বলে।

ঝাউ বন দেখে ওরা সূয অস্তের আধ ঘণ্টা আগে ফিরে আসে। সমুদ্রের ধারে কত স্ত্রী পুরুষ, গল্প করছে, ছোট ছেলেরা খেলে বেড়াচ্ছে। ওরা দুজনে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

সূর্য তার বীর্য-রশ্মি ধরে যান' অস্তাচলে নয়, তাঁর চলে যাবার মধ্যে রয়েছে একটা রাজষিক ভঙ্গি—সমুদ্রের আসক্তিতে সূর্য তাঁর সমস্ত রক্তিম চেতনাকে সাথে নিয়ে যেন অক্ষয় প্রেমকে সার্থক করে তোলবার জন্য একটু একটু করে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছেন। ওরা সূর্যকে প্রণাম করে ফিরে আসে ওদের হোটেলে।

বেয়ারা এসে ওদের চা আর খাবার দিয়ে যায়। খাবার খেয়ে ঝুমুর নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। এখন সে সত্যি সত্যি ক্লান্তি বোধ করছে !

কঙ্কন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে অনেক হেঁটে গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে ?

না, খুব বেশী নয়, কিন্তু খুব ভাল লাগছে জলের আছড়ে পড়ার শব্দ।

ওদের ঘরের জানালা দিয়ে সমুদ্রের ফেনাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

কঙ্কন বলে—সত্যি, শব্দের মধ্যে কি যেন উদার, কি যেন মহান একটা বাণী রয়েছে, বুঝেও বোঝা যায় না। ওরা দু'জনে পাশা-পাশি শুয়ে পড়ে। চাঁদ তখন কিশোরী,—ষোড়শী হবার মানসে ওদের ঘরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যায়। কথা বার্ত্তা বিশেষ নেই একটা মধুর নিস্তব্ধতা—কিছুক্ষণের মধ্যেই কঙ্কন ওকে তীব্র আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে ফেলে। ঝুমুর ওর ইচ্ছায় একটু স্পর্শ কঙ্কনের শুকনো তামাটে ঠোঁটে ছুঁইয়ে দেয়। আকিঞ্চনের তীব্র কামনায় ওর তামাটে ঠোঁটও রঙিন হয়ে ওঠে। ওদের দুজনের দেহও যৌবন আদিম ইচ্ছার পরিপূর্ণতার জন্য ডুবে যায় কঙ্কাল কামনায়—

* * *

তার পর অনেক দিন কাটে! প্রায় একটা বছর, মোক্ষদার প্রতি দিন পত্রের উত্তরে ঝুমুর লেখে, আর একটা মাস অপেক্ষা কর মাসী। ওরা ভুবনেশ্বর কণারক, গোপালপুর, চিল্কা এমন কি মদ্র দেশের অর্দ্ধভূমি এর ভেতর দেখে ফেলেছে ঝুমুর কঙ্কনকে বলে,—এ হোটেল-জীবন আর ভাল লাগে না, চল একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে, ঘর সংসার করি।

কঙ্কন হেসে বলে কিন্তু আমায় যে ফিরে যেতে হবে।

কোথায়! ঝুমুর বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

সীমান্তে—।

সেকি!

হ্যাঁ আমি তো শিক্ষা শিবিরে ছিলাম, এই দেখ যোগ দেবার জন্য জোর তাগিদ এসেছে। কঙ্কন একটা চিঠি ঝুমুরের হাতে দেয়।

ঝুমুরের মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

কঙ্কন বলে—দেখ ঝুমুর, সমাজের সংসার যারা করেন তাঁরা সংসারের সেবা, সন্তানের সেবা, করে জীব ধর্ম্মের কিছুটা কাজ করে যান। ঠিক সেই রকম আমাদেরও কিছু করবার জন্য পথ বেছে নেওয়া উচিত। তোমার অর্থের প্রাচুর্য্য আছে ইচ্ছে ক'রলে অনাথ আশ্রমটাকে আরো ভাল করে গ.ড় তুলতে পার আসবার সময় মহেন্দ্রকে সব বলে এসেছি, যে অন্যায় দেখে তুমি একদিন শিউরে উঠেছিলে, সে অন্যায়ের পরিপন্থী হ'য়ে, একটা আদর্শ মহিলা-নিবাসও খুলতে পার। যে শিশুটিকে কুড়িয়ে এনেছ, তাকে প্রকৃত মানুষ করবার চেষ্টা করতে পার।

ঝুমুর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আজ এসব কথা কি বলছ!

বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসি তাই সবার সামনে তোমায় ছোট করতে চাইনে ফিরে গিয়ে সংসার পাতবার সৎসাহস আমার আছে, কিন্তু সে সংসারে তুমি নিজেই সুখী হবে না। তুমি আমায় ভুল বুঝ না, অভিমানও ক'রো না। এমনও তো হতে পারতো, আমাদের বিয়ের পর, হয় তুমি নয় আমি, যে কেউ একজন মরে যেতে পারতাম সে বিচ্ছেদ তো আমাদের মেনে নিতে হতো।

তবে বল অনুকম্পার মন নিয়ে তুমি আমায় গ্রহণ ক'রেছ ভালবেসে নয়, হঠাৎ এমন বিরূপ হলে কেন, চলেই বা যেতে চাইছ কেন।

আমি কি তোমায় সুখী করতে পারি নি সে সুখের স্মৃতি কি চির মধুর নয়!

এত সুখ এত আনন্দ কোন দিন কেউ পেয়েছে কিনা জানি না।

তোমাকে আনন্দ দেবার জন্য তোমায় চাইনি, আনন্দ পাব বলে তোমায় চেয়েছিলাম। আরে! তুমি এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে কেন, আমি কি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। এখনো পনেরো দিন সময় আছে,—

এ পনেরো দিনকে আমাদের জীবনের সব চ.ইতে মধুর করে গড় তুলতে হবে।

যতদিন যায়, ঝুমুর কঙ্কনকে তত আঁকড়ে ধরে, কঙ্কন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, দূরে গিয়ে মনে হবে আমাদের প্রতিদিনের কথা, প্রতি রাত্রের কথা, সৈনিক শিবিরে শুয়ে সেই চাঁদ, সেই সূর্যকেই দেখবো, যে চাঁদ, যে সূর্য তোমার আমার জন্ম মুহূর্ত্তে একই ভাবে উঠেছিল। প্রতিদিনের স্পর্শে কঙ্কন ঝুমুরকে বিদায় মুহূর্ত্তের জন্য তৈরী করে তোলে।

তারপর সত্যি সত্যি সরকার মশায় ঝুমুরকে নিয়ে যাবার জন্য পুরীতে আসেন। পরের দিন ঝুমুরকে পুরী ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিদায় রাত্রে ঝুমুর সম্পূর্ণ নীরব, দুঃখের বা আনন্দের এতটুকু আভাস তার চোখে নাই।

কঙ্কন ওর নির্বিকার ভাব দেখে বলে। এত শান্ত হলে অপরে অশান্তি পায়। এমন করলে বোকা হয়ে তোমার আঁচলের নীচে চিরকাল বসে থাকবো কিছুতেই কোথাও যাব না। পোষা পাখীর শিখানো বুলির মত প্রেমের কথা বলবো।

অনেকক্ষণ পরে ঝুমুর কথা বলে—ও বলে,—জগৎগুরু কানে একদিনই মন্ত্র দেন, সেই একদিনের একটা মন্ত্র, চিরকাল জপতে হয়। তোমার ভালবাসা আমার স্মৃতির মন্ত্র।

ভোরে উঠে ওরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আবার সূর্য্য প্রণাম করে। তিল তিল করে, ঝুমুরের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে আসে, কঙ্কন ওর মালপত্র গুছিয়ে দেয়। ষ্টেশন পর্য্যন্ত ওর সাথে আসে।

ঝুমুর বলে, কোথায় তুমি যাবে বল্লে নাতো ?

আপাততঃ তোমার খুব কাছেই থাকবো, ভেবো না ; প্রতিদিন তোমায় চিঠি দেবো।

আবার গার্ড সাহেব বাঁশী বাজান, ঝুমুর কঙ্কনের হাতটা চেপে ধরে, কঙ্কন ওর হাতটা কপালে ছুঁইয়ে বলে, ছুটি পেলেই ছুটে তোমার

কাছে যাব, ট্রেণ তখন তার গতি বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে! ট্রেণের সাথে সাথে কঙ্কনও ছুটে চলেছে পাগলের মত। ঝুমুর শঙ্কিত হয়ে বলে, তুমি আর এগিয়ে এস না হঠাৎ পড়ে যাবে।

বল তুমি আমায় ভুল বোঝ নি ?

তুমি আমার ভুল জিনিষ নও তাই তোমায় আমি ভুল বুঝি নি।

কঙ্কন ওর কথাগুলো শোনবার জন্য একটু দাঁড়ায়। ট্রেনটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

ঝুমুর হাওড়া ষ্টেশনে নেমে ড্রাইভারকে বলে, বাড়ী যাবার আগে একবার বেলুড় যাব। বেলুড়ে নেমে ঝুমুর বেলুড়ের মাটি প্রণাম করে প্রসারিত গঙ্গার ধারে দাঁড়ায়, এই সেই গঙ্গা—যার পারে দাঁড়িয়ে, কঙ্কন ওকে পুণ্য-স্পর্শ দিয়েছিল। আর আজও সেইখানে দাঁড়িয়ে বেলুড়ের সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করে—

প্রভু বলতে পারেন, স্বামী কে ?

জানি, যিনি মোহং নির্ব্বিকার সর্ব্বেশ্বর।

যোগী যোগীর মত উত্তর দেন, গৃহী, গৃহীর মত গ্রহণ করে। ঝুমুর কঙ্কনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে।

সঙ্গীহীন একাকী বিহঙ্গম মন্দিরের চুড়া তিনবার প্রদক্ষিণ করে দেশান্তরে চলে যায়। যাবার পথে রেখে যায় তার জীর্ণ বয়সের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি শুভ্র পালক। এই মাটির, এই দেশের, এই সমাজের কাহিনী আঁকবার জন্য।

-আভা দেবীর লেখা আরো কয়েকটি পুস্তিকা-

অর্চ্চনা (কাব্যগ্রন্থ)

....“আভা দেবীর অর্চ্চনা বঙ্গভারতীর প্রকৃত অর্চ্চনা”

—শনিবারের চিঠি

আরো এক পাতা

কয়েকটি অভিনব ছোট গল্পের সমষ্টি

.....ডাক্তার ও মণিবউ নামক ছোট গল্প দুইটি বাংলা সাহিত্যের অবদান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।......

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বহ্নিছায়া (ছোট উপন্যাস)

"This is a Bengali novel in a short compass. The authoress, though a new comer in the field, has written this Sociopsychological story with a style of her own." ....

-Hindusthan Standard.

লেখিকার লেখা আরো একটি বড় উপন্যাস

“মহাদেশ”

প্রস্তুতীর পথে।